৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার-০৩

টপিক: বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি (ধারণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, কার্যাবলি, কূটনীতিকদের অব্যাহতি ও দায়মুক্তি), মুক্ত বাণিজ্য, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, জাতিসংঘ ব্যবস্থা, উন্নয়নশীল দেশগুলোর LDC থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক) মানবাধিকার এজেন্ডা।

46 তম বিসিএস

International Affairs

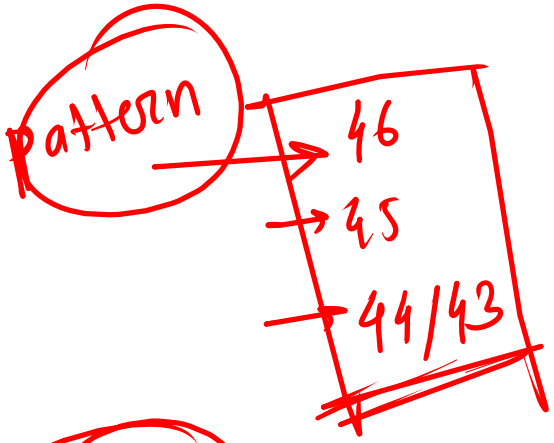

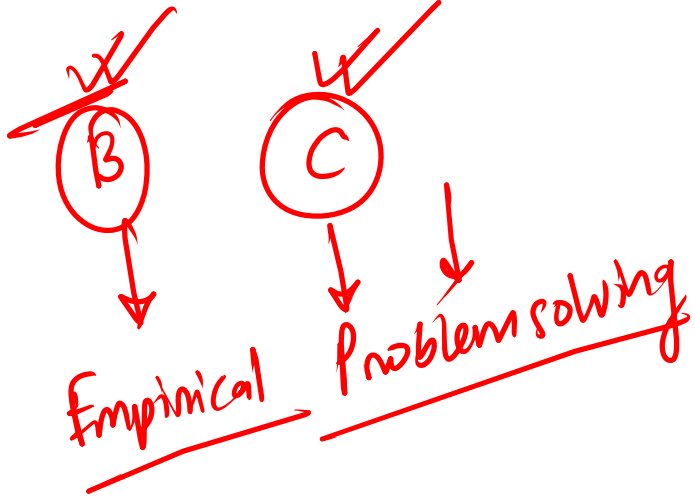

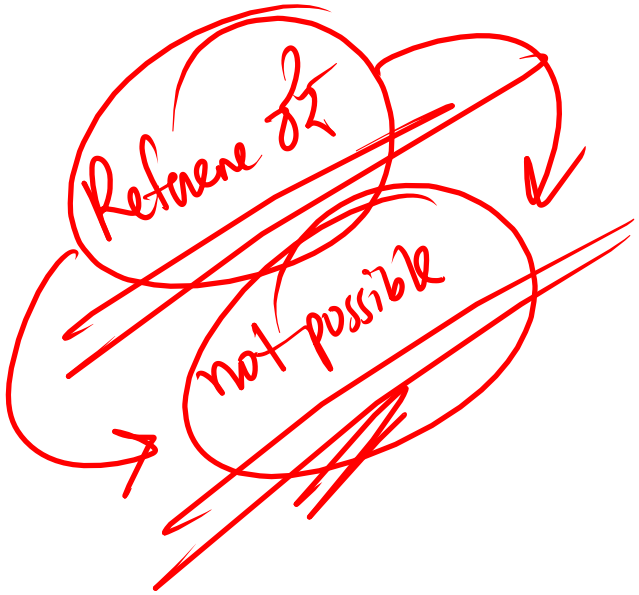

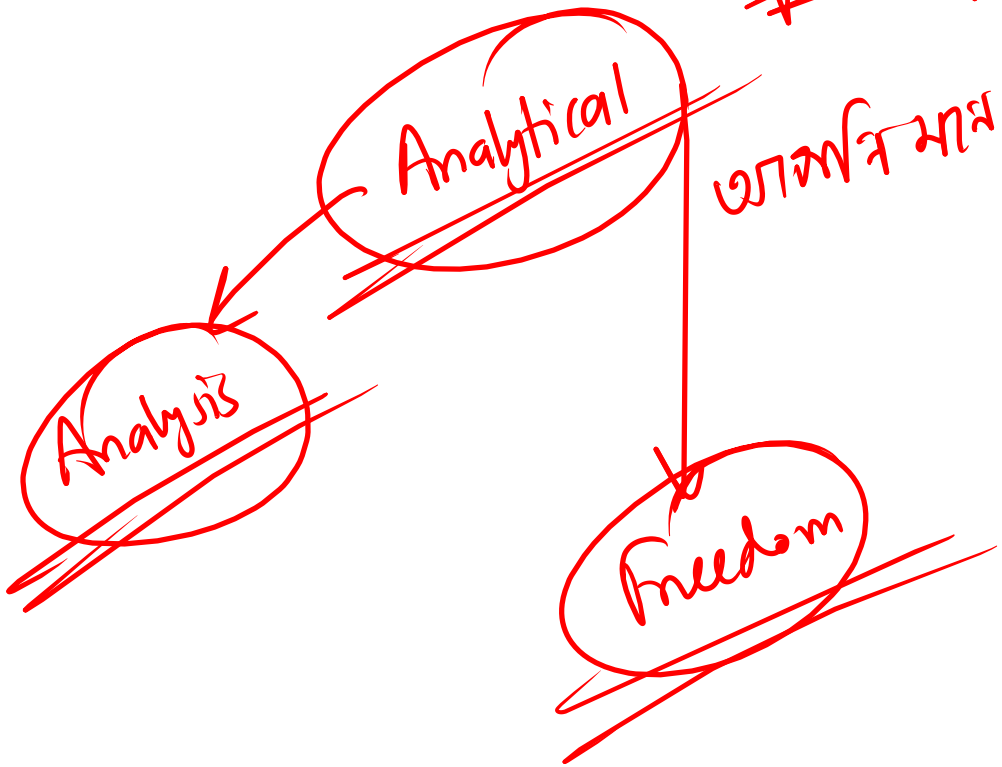

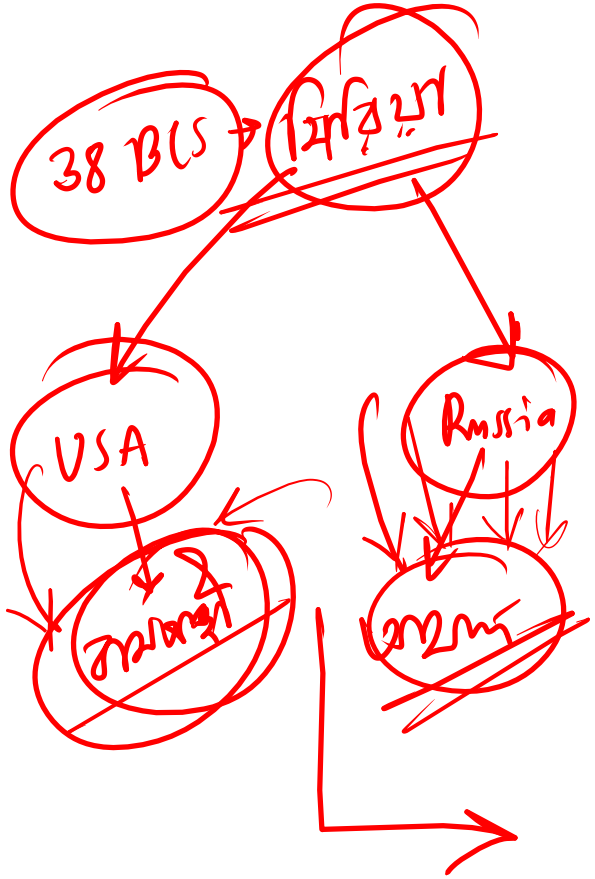

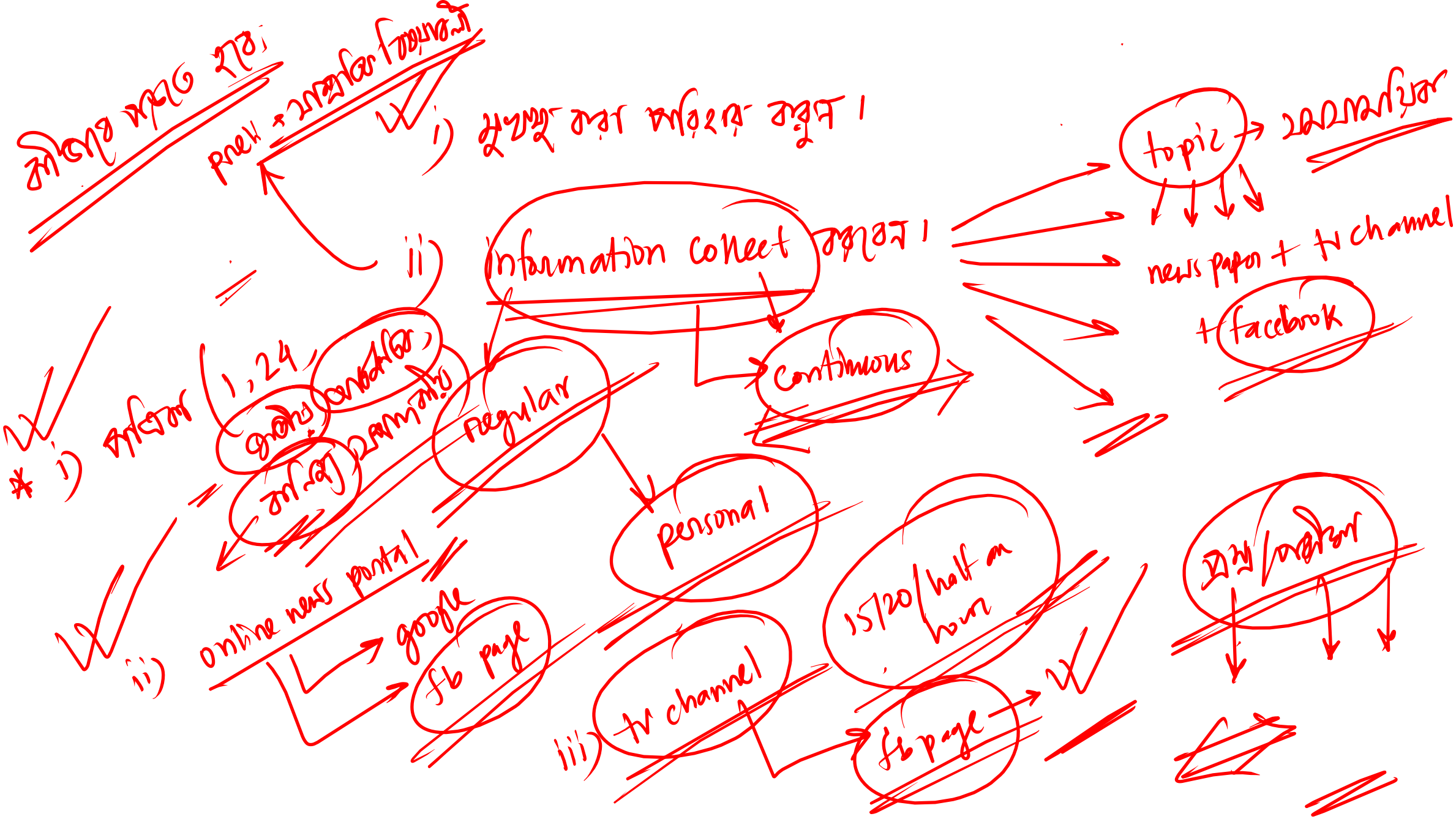

i) মুখস্থ করা পরিহার করুন।

ii) Information collect করুন।

topic → সমসাময়িক

news paper + tv channel + facebook

regular

continuous

personal

15/20/half an hour

* i) পত্রিকা (1, 24, প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, সমসাময়িক)

ii) online news portal → google, fb page

iii) tv channel → fb page

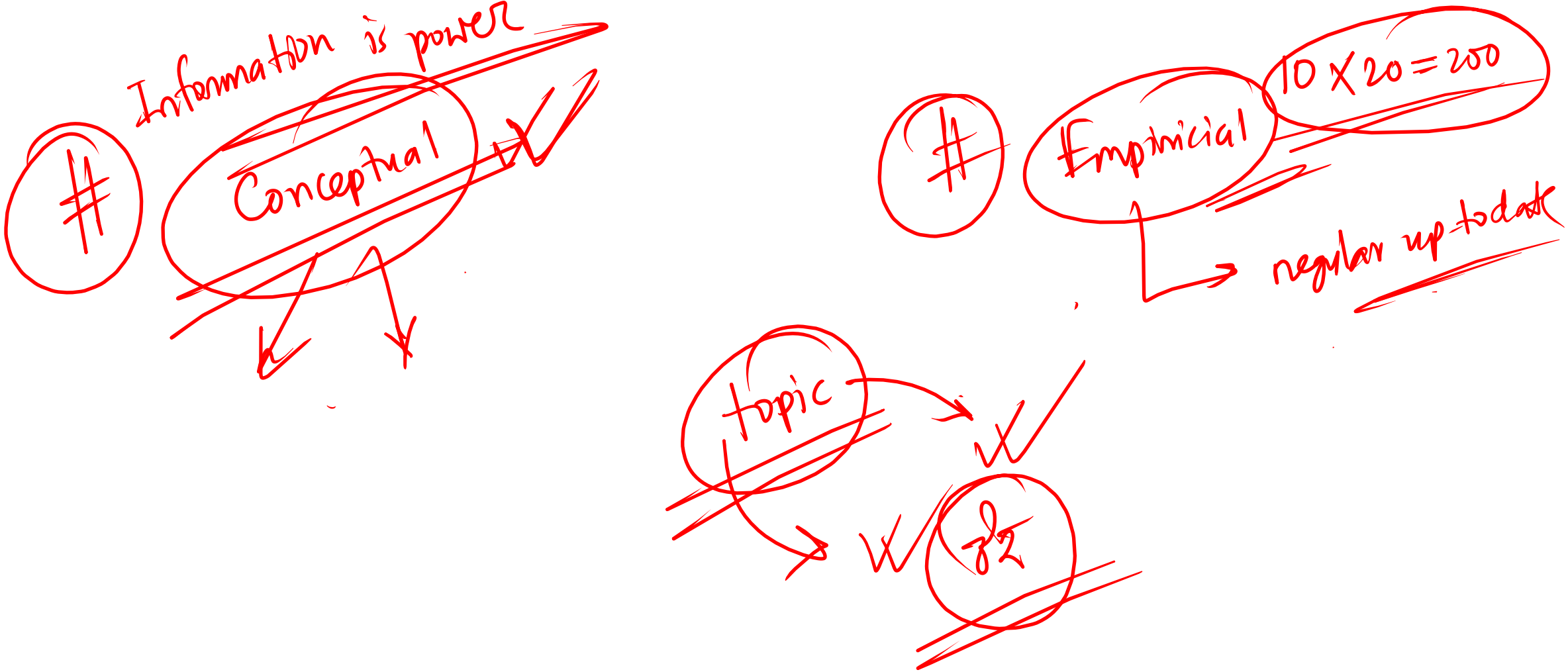

Information is power

Conceptual

Empirical

10 X 20 = 200

regular up-to-date

topic

- পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে লার্কে ও সৈয়দ বলেন, "The foreign policy of a state usually refers to the general principles by which a state governs its reaction to the international environment."

- Prof. Padelford ও Lincoln বলেন, "Foreign Policy is the overall result of the process by which a state translates its broadly conceived goals and interests into specific courses of action in order to achieve its objectives and preserve its interests"

- Joseph Frankle বলেন, "Foreign policy consists of decisions and actions, which involves to some appreciable extent relations between one state and others"

Foreign policy

→ external version of the domestic policy

national interest

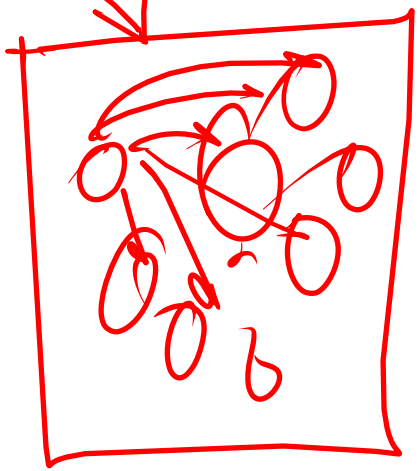

Diplomacy → tools

→ Execution of foreign policy

কূটনীতি

→ দ্বিপাক্ষিক (BD-IND)

→ বহুপাক্ষিক (UN, ASEAN)

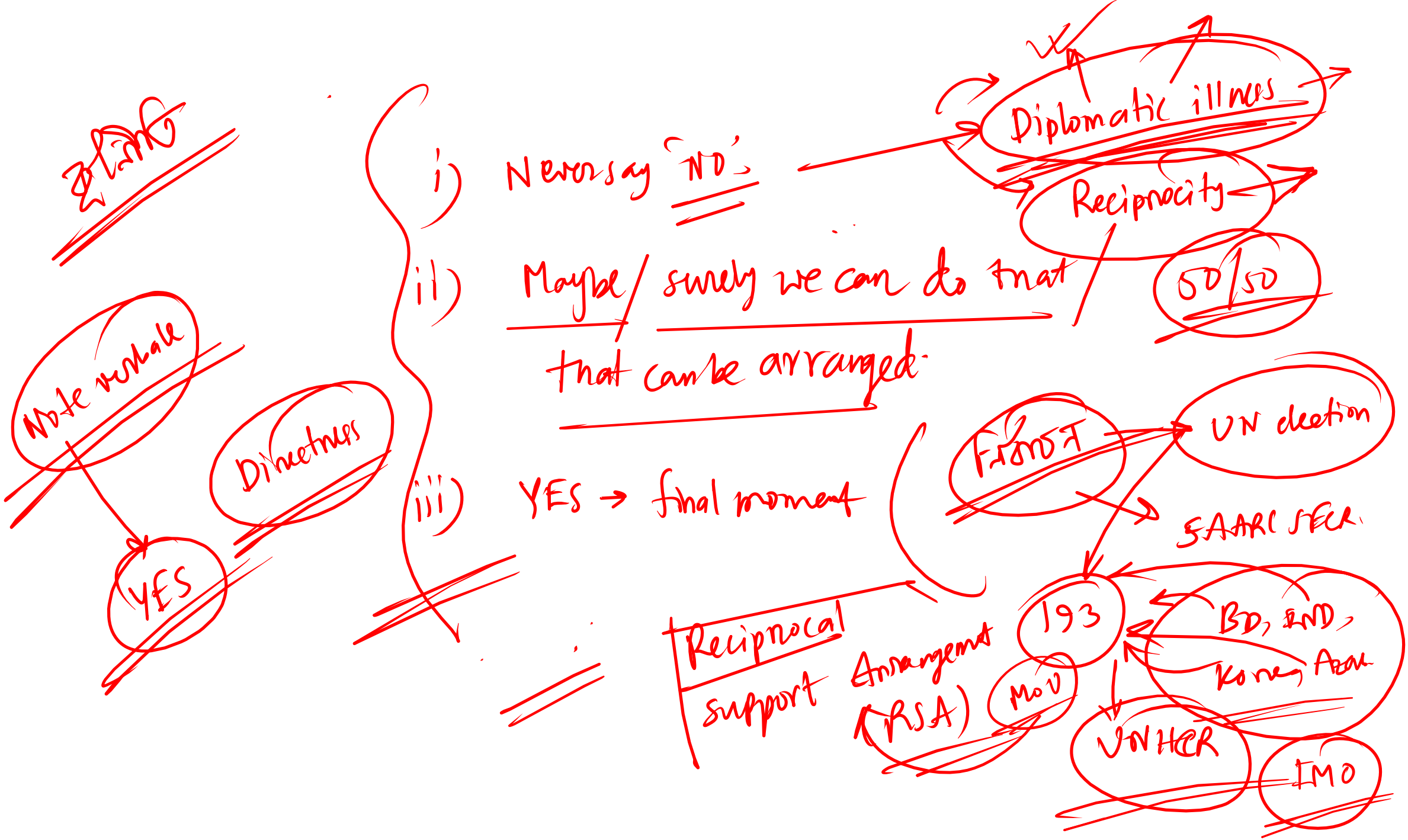

ইতিবাচক

Note verbale → YES

Directives

i) Never say 'NO'

ii) Maybe / surely we can do that / that can be arranged.

iii) YES → final moment

Diplomatic illness

Reciprocity

50/50

নির্বাচন → UN election → 193

SAARC SECR.

BD, IND, Korea, Azer

UNHCR

IMO

Reciprocal support Arrangement (RSA)

MoU

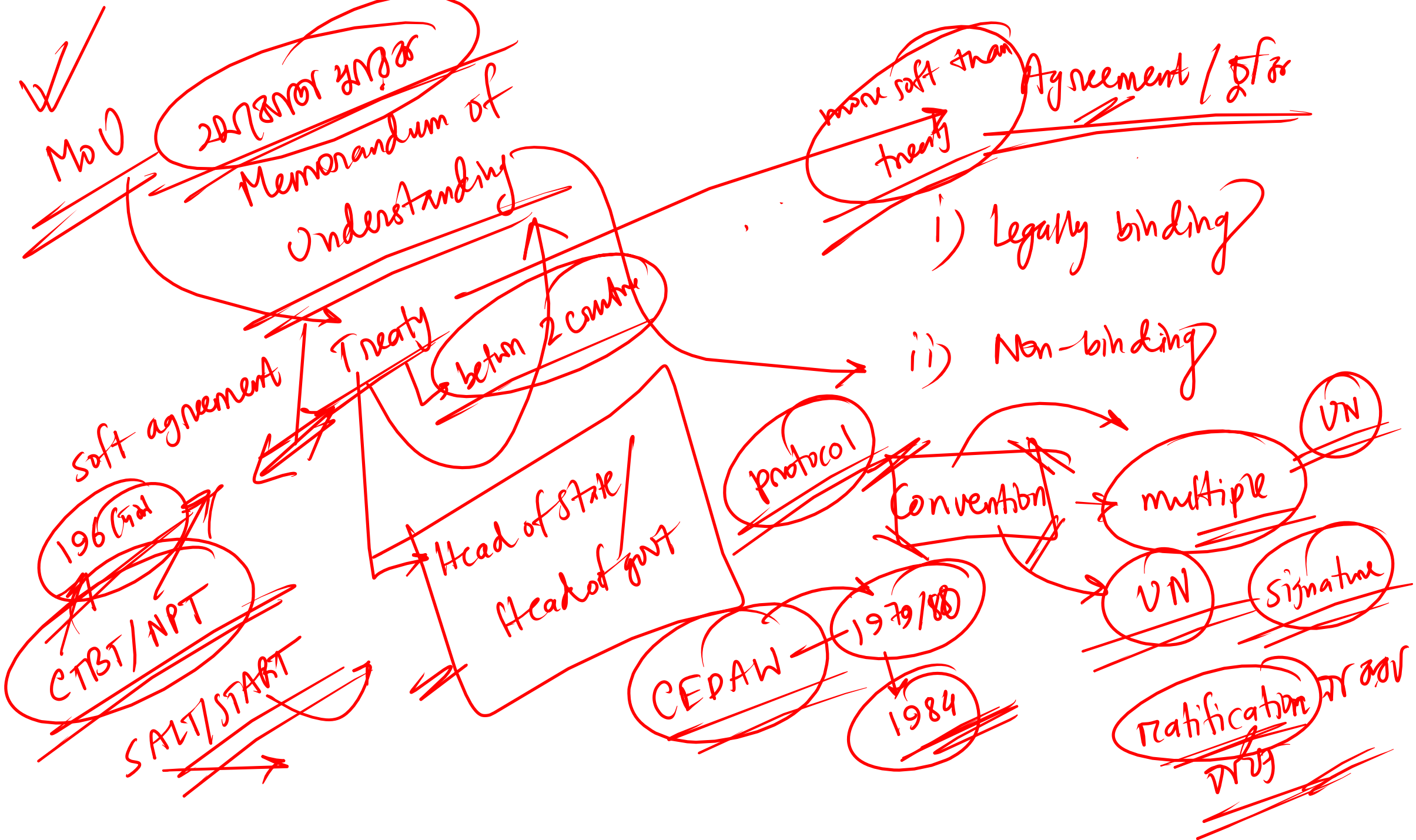

MoU
সমঝোতা স্মারক
Memorandum of Understanding
Treaty
betwn 2 country
Soft agreement
1960
CTBT / NPT
SALT / START
Head of State
Head of govt
more soft than treaty
Agreement / চুক্তি
i) Legally binding
ii) Non-binding
protocol
Convention
multiple
UN
UN
Signature
Ratification
CEDAW
1979/80
1984

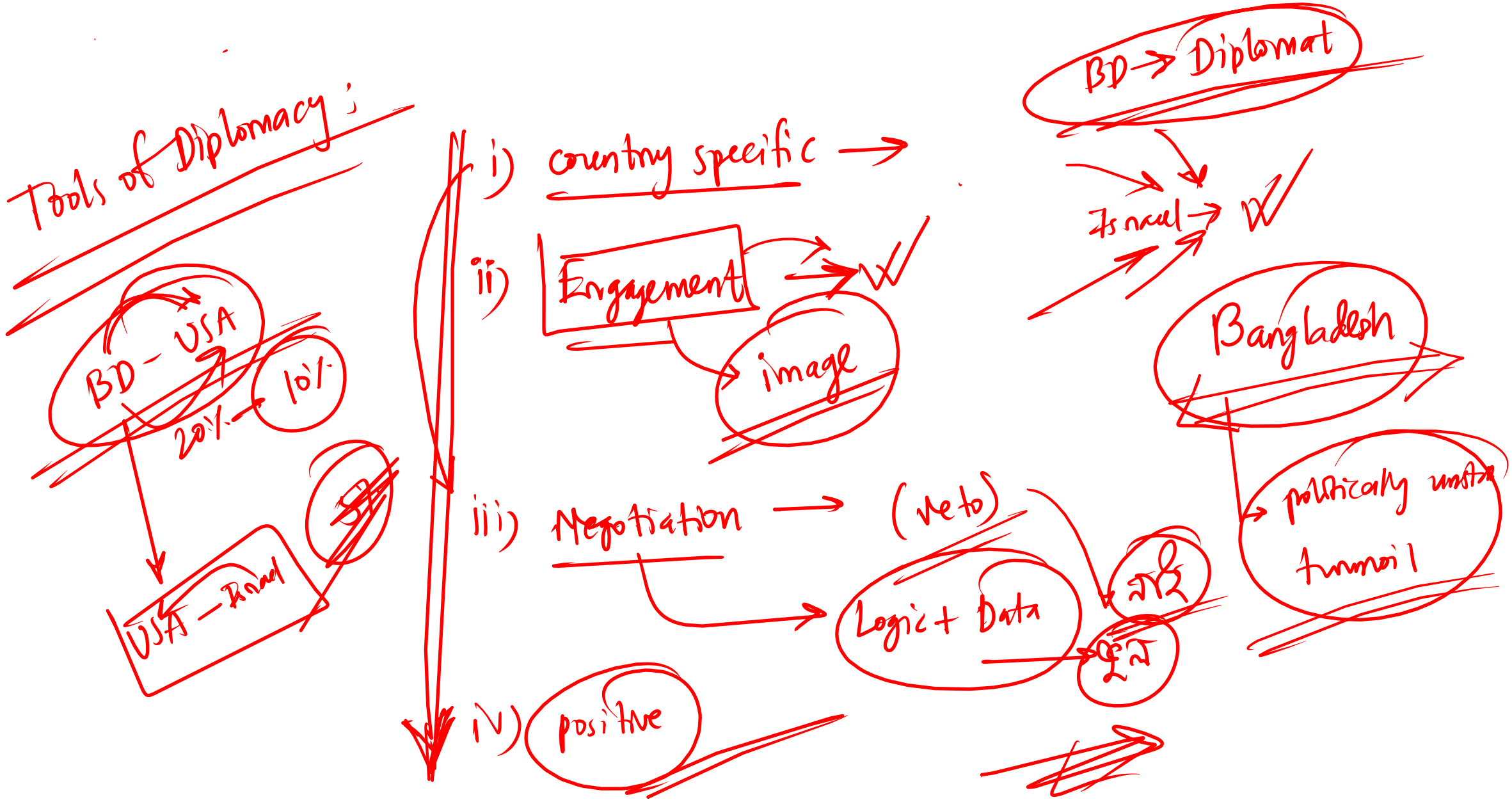

Tools of Diplomacy :

BD - USA 20% → 10%

USA - Israel

i) country specific → BD → Diplomat → Israel → X

ii) Engagement → image → X

iii) Negotiation → (veto) → Logic + Data

iv) positive

Bangladesh → politically unstable turmoil

❖ পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকসমূহ-

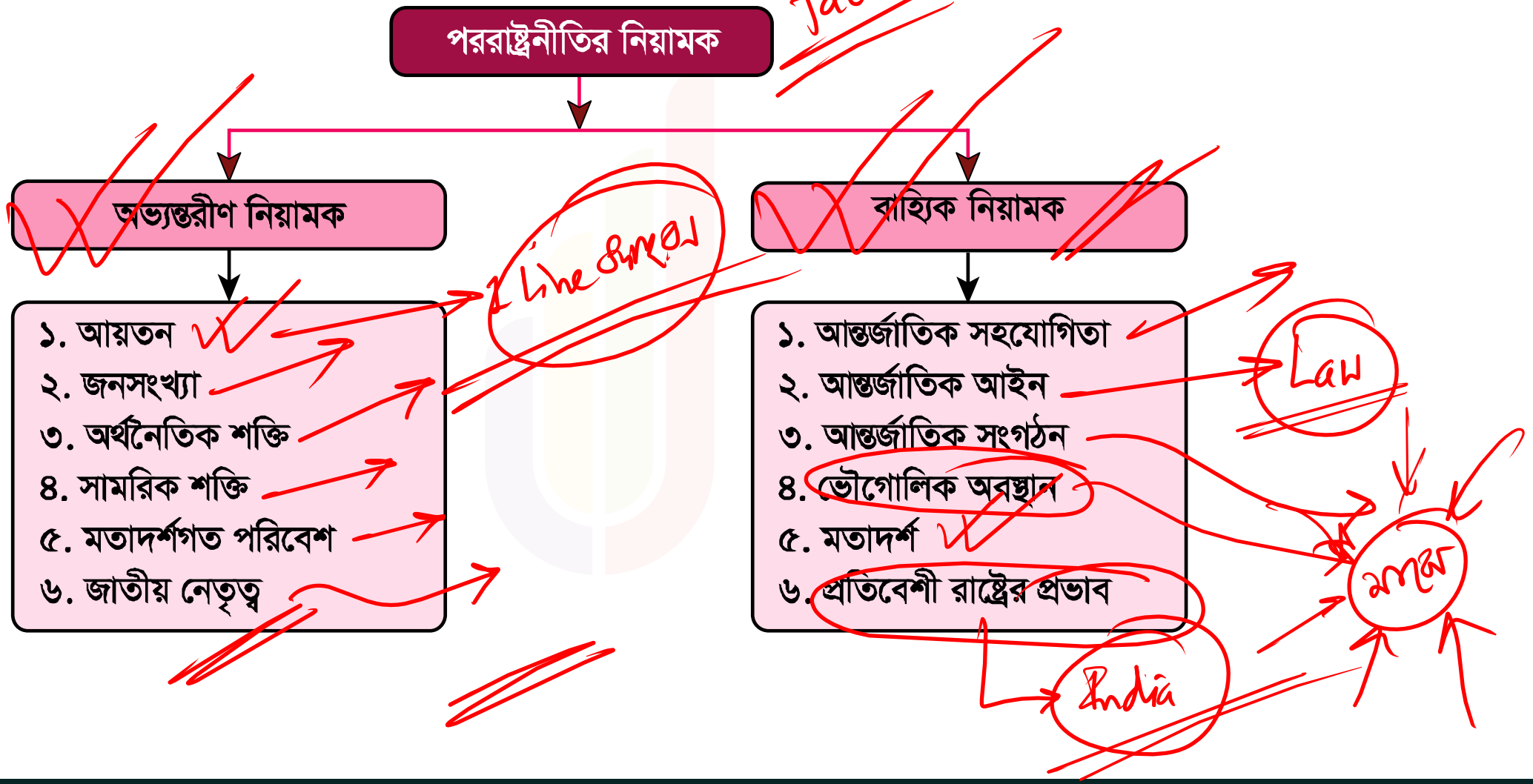

উত্তম পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

এক একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি একেক রকম হলেও একটি বিষয়ে সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন। আর তা হলো নিজ দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা। প্রতিটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হয় নিজ স্বার্থকে কেন্দ্র করে। তারপরও বিশ্ব কল্যাণের জন্য, পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বাড়ানোর জন্য উত্তম পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা হয়। নিচে উত্তম পররাষ্ট্রনীতির কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

- ✓ নিজ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা।
- ✓ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপক্ষীয় যত সমস্যা আছে তার সমাধান করা।
- ✓ পররাষ্ট্রনীতিতে সবার সাথেই বন্ধুত্ব এবং কারোর সাথেই শত্রুতা নয় এমন নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- ✓ সকলের সাথে মতপার্থক্য দূর করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা উত্তম পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- ✓ পররাষ্ট্রনীতি এমনভাবে সাজাতে হবে যেন পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন না ঘটে কারণ মনে রাখতে হবে প্রতিবেশী দেশ যদি অস্থিতিশীল হয় তবে সেই দেশটিও অস্থিতিশীল হবে। তাই নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রতিবেশীর শান্তি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন: কোনো কারণে যদি মায়ানমার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে তাহলে এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়বে।
- ✓ পররাষ্ট্রনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো কোনো প্রকার জঙ্গিবাদ যেন মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।
- ✓ প্রত্যেক রাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ প্রয়োজন, সব রাষ্ট্রেই এ কাজের জন্য পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো বা ব্যবস্থা রয়েছে। তাই উত্তম পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

বর্তমান বহু মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন বিরাট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন: আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানকে পাশ কাটিয়ে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এসব দেশসমূহ অর্থনীতির চাবিকাঠি হিসেবে পরিগণিত। তাই তারা যেমন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে বলে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তেমন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হয়। বহু মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বেও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাকে কেউ ছোট করে দেখে না। তাই প্রতিটি দেশই তাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। তাই উত্তম পররাষ্ট্রনীতির ইচ্ছা থাকলেও প্রণয়ন করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।

কূটনীতি

- উড্রো উইলসন তাঁর "Fourteen Points" বইয়ে বলেছেন, "কূটনীতি সর্বদা খোলামেলাভাবে ও জনসাধারণের দৃষ্টিতে অগ্রসর হবে।"
- Harold Nicolson এর মতে, "Diplomacy is guiding international relations through negotiation and the manner in which it manages ambassadors and envoys of these relations and diplomatic working man or his art."
- প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন (Padelford and Lincoln) এর মতে, "কূটনীতি বলতে প্রতিনিধিত্বের এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ প্রথাগতভাবে একে অপরের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।"
- মরগ্যানথ্যু (H. G. Morgenthau) এর মতে, "কূটনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মস্তিষ্ক স্বরূপ।" তাঁর মতে, "কূটনীতি বলতে বোঝায় সকল স্তরের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ।"
- উড ও সেরেস (J.R. Wood and Jean Serres) এর মতে, "শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের কৌশল হচ্ছে কূটনীতি।"

সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারিভাবে আন্তঃক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকেই বলে কূটনীতি।

কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy)	কূটনীতি (Diplomacy)
১. পররাষ্ট্রনীতি হলো কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের গৃহীত সেসব নীতি, যা রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পাদন করে থাকে।	১. কূটনীতি হলো বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ।
২. পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য দেশের স্বার্থ রক্ষা করা	২. পররাষ্ট্রনীতিকে সার্থক করে তোলাই কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য।
৩. প্রতিটি দেশের জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে পররাষ্ট্রনীতি প্রস্তুত করা হয়।	৩. কূটনীতি কোনো লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য সাধনের মাধ্যম। কূটনীতি উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি পদ্ধতি।
৪. পররাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্র সম্পর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত।	৪. কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
৫. পররাষ্ট্রনীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে থাকে কোনো দেশের আইনসভা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৫. কূটনীতির কোনো স্বাধীন সত্তা নেই; কূটনীতিককে পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে থেকেই কাজ করতে হয়।
৬. পররাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু কী রূপ হবে, তা নির্ভর করে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের ওপর।	৬. কূটনীতি, প্রণীত পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করে।
৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম কখনো স্থগিত হয়ে যায় না বা পররাষ্ট্রনীতি স্থগিত হয় না।	৭. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোনো কোনো সময় কূটনৈতিক কার্যাবলি সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয়।
৮. পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কূটনীতিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।	৮. কূটনীতি ব্যর্থ হলে পররাষ্ট্রনীতি বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৯. সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।	৯. অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তি আবশ্যক।
১০. সংকটকালে পররাষ্ট্রনীতি ভূমিকা মুখ্য নয়।	১০. কূটনৈতিক কার্যক্রম সংকটকালে চলতে থাকে।
১১. পররাষ্ট্রনীতিকে বলা হয় Vision of State।	১১. কূটনীতিকে বলা হয় Mission of Foreign Policy।

কূটনীতি

❑ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ

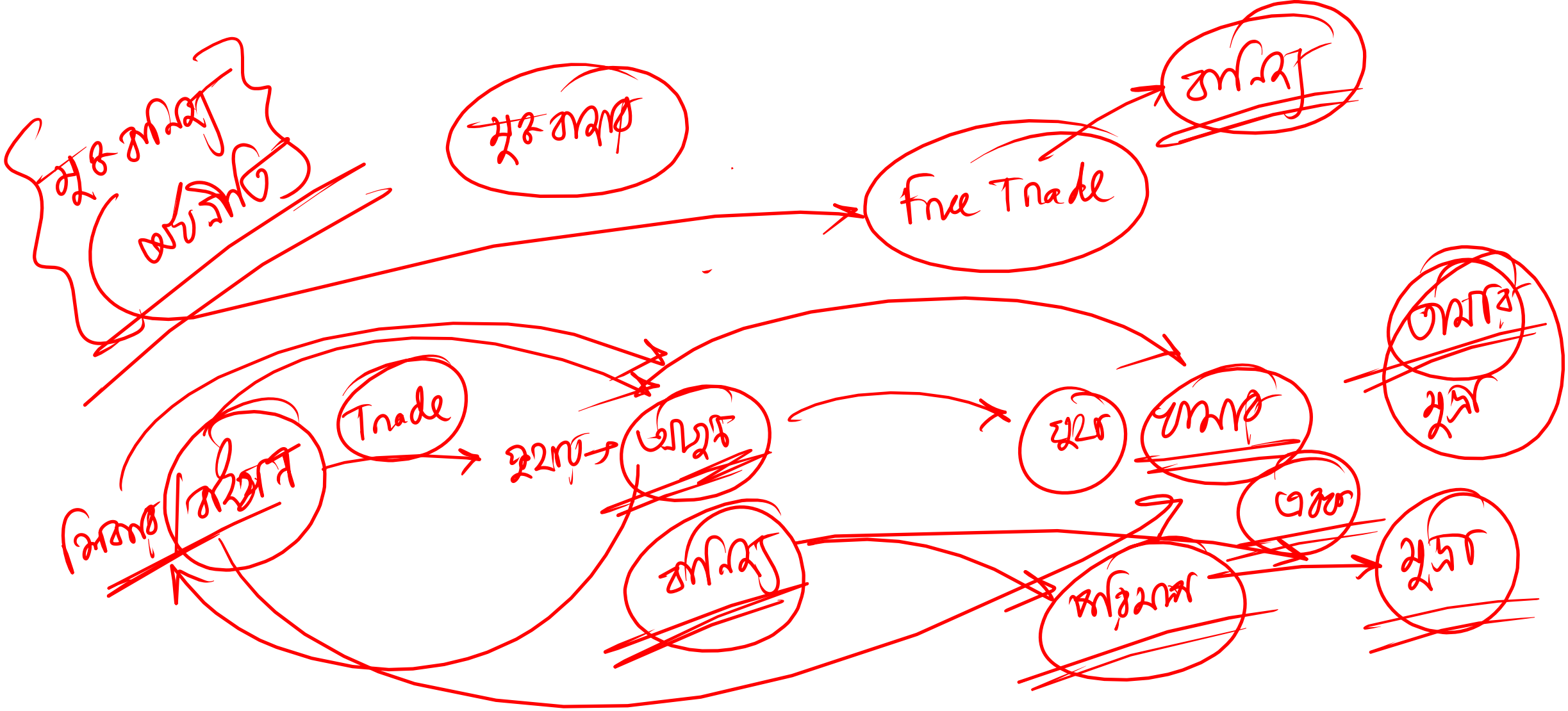
Free Trade
Trade

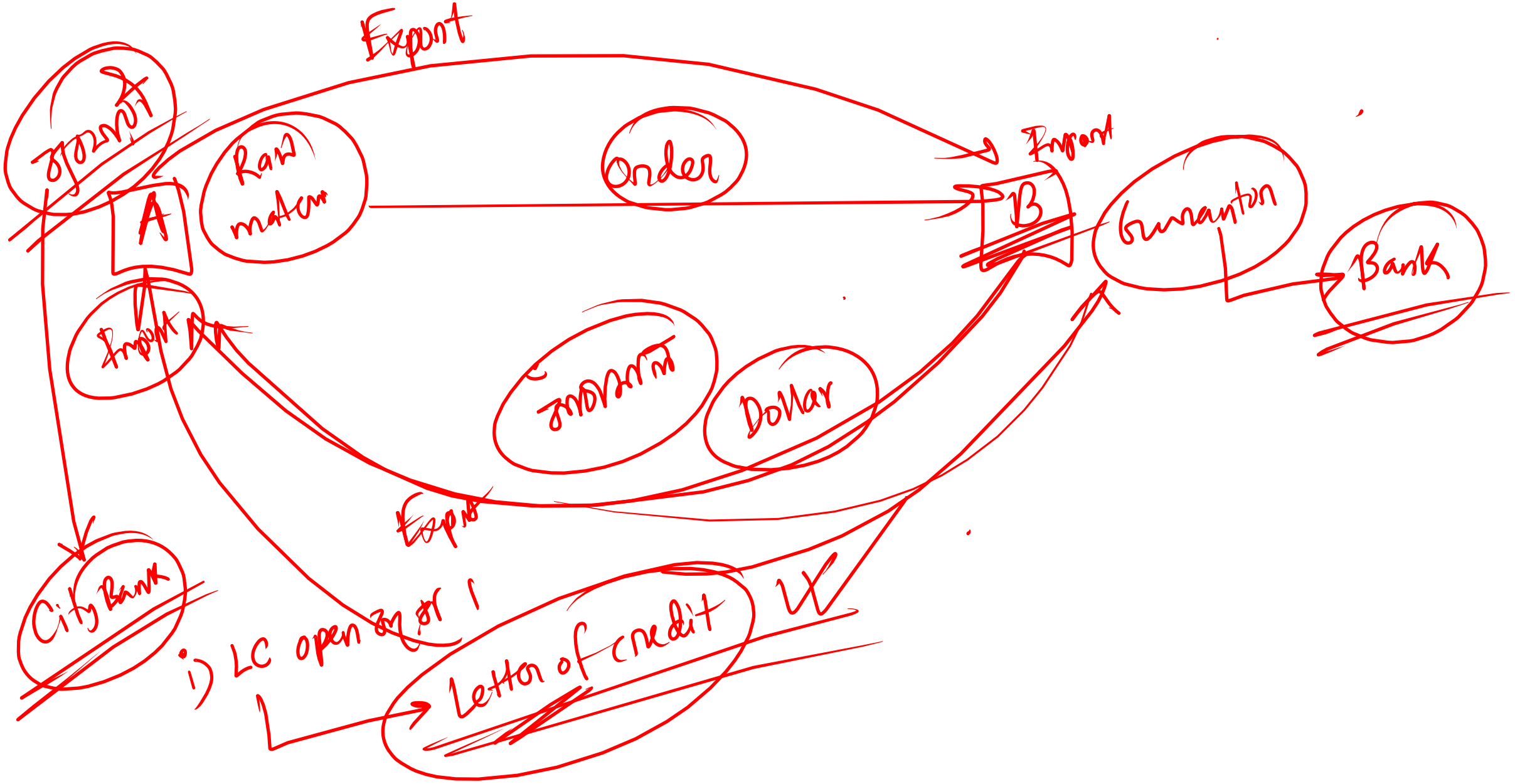

Export
A
Order
B
Bank
Dollar
City Bank
Letter of credit

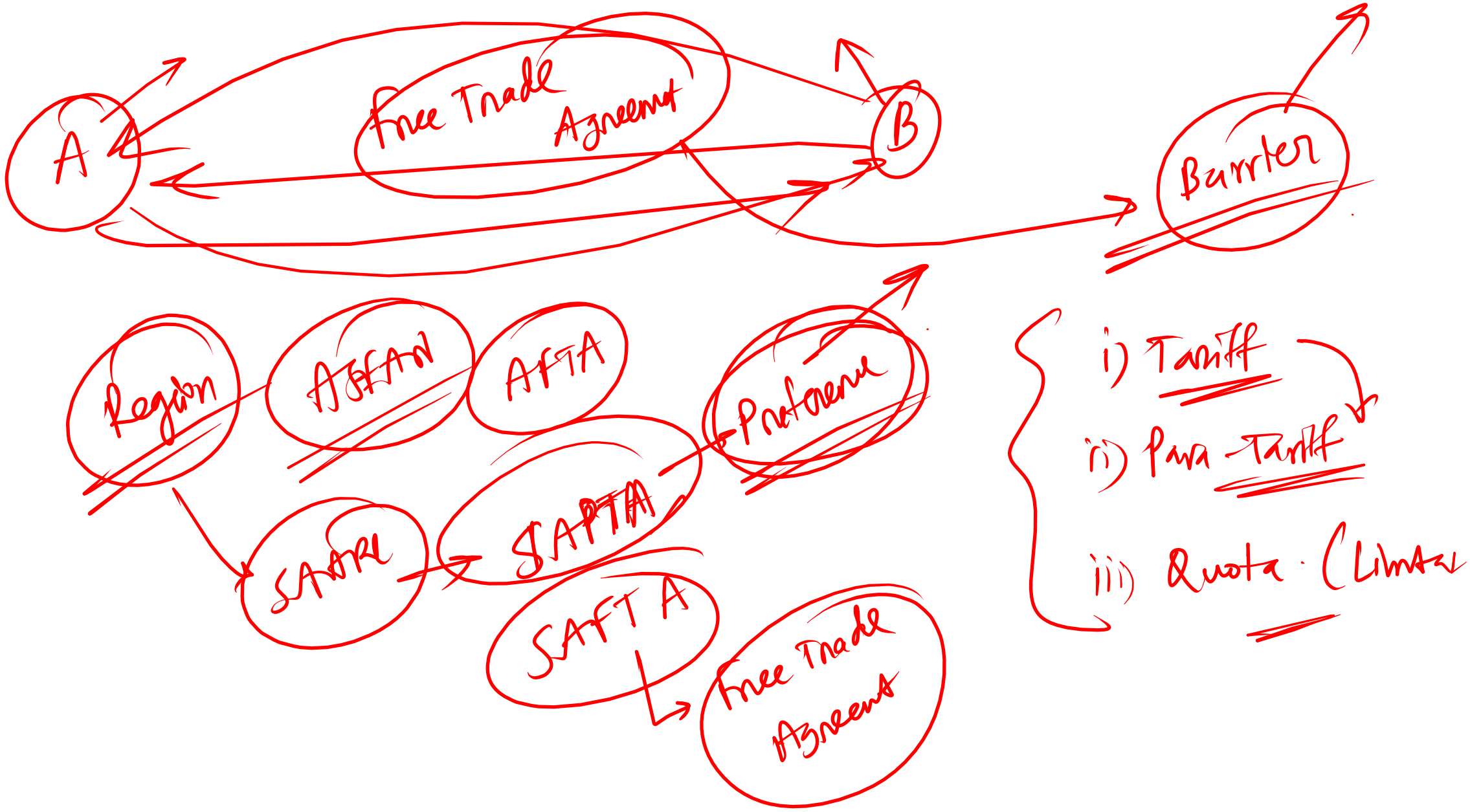

A
Free Trade Agreement
B
Barrier
Region
ASEAN
AFTA
Preference
SAARC
SAPTA
SAFTA
Free Trade Agreement
i) Tariff
ii) Para-Tariff
iii) Quota

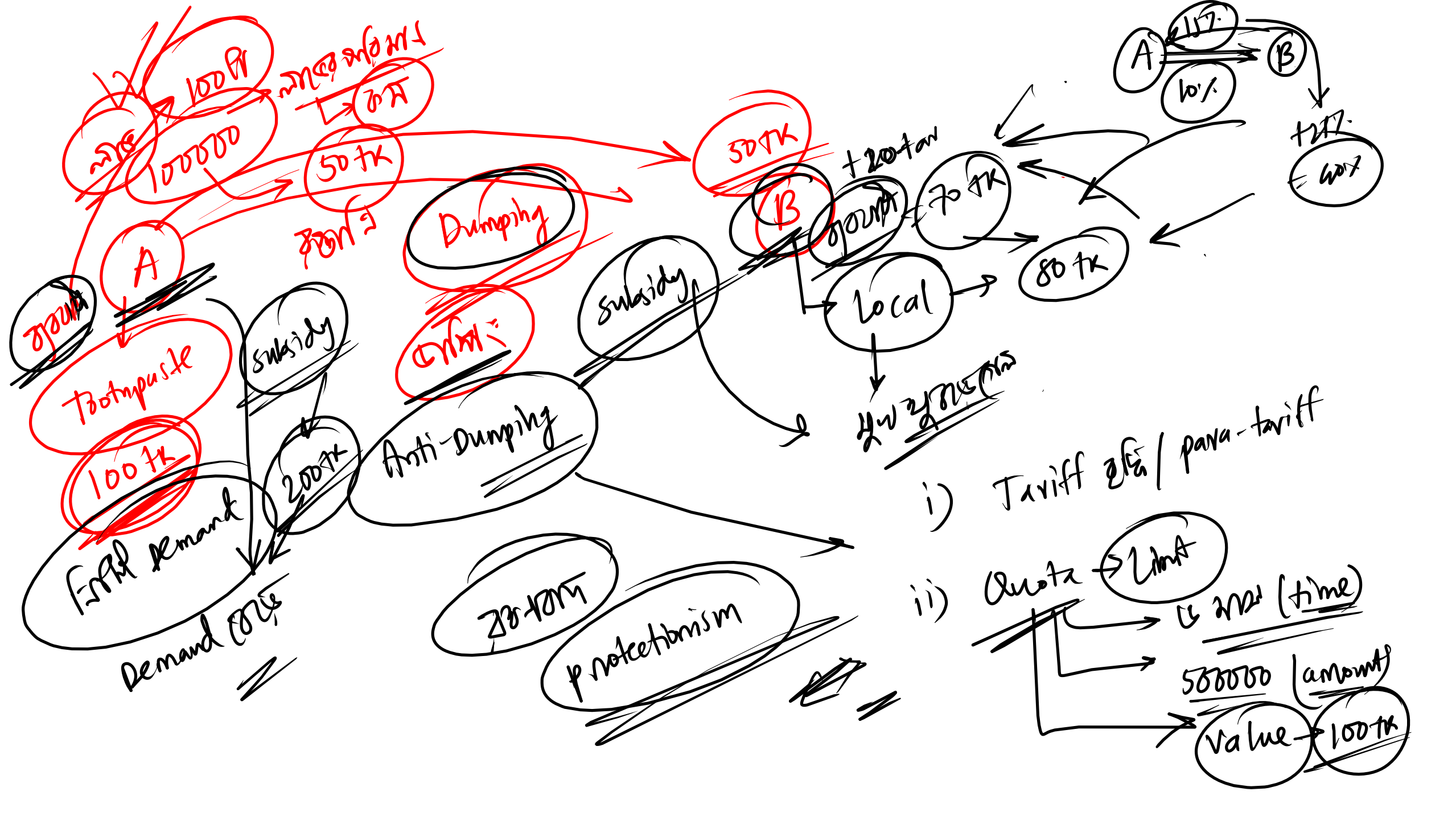

A
B
1000000
50 TK
Dumping
Toothpaste
100 TK
Subsidy
200 TK
Anti-Dumping
Subsidy
B
+20 tax
70 TK
80 TK
Local
A
15%
10%
B
i) Tariff / para-tariff
ii) Quota → Limit
(time)
500000 (amount)
Value → 100 TK
protectionism

সাংস্কৃতিক কূটনীতি (Cultural Diplomacy)

কোনো দেশের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরার জন্য যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হয়, তাকে বলা হয় Cultural Diplomacy/সাংস্কৃতিক কূটনীতি। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ক্ষেত্রে উক্ত পরিভাষা দ্বারা প্রাথমিকভাবে বহির্বিশ্বে তাদের ভাষাকে লালন ও বিকাশ সাধনে সহায়তা বুঝায়। মিশনে কর্মরত কালচারাল এ্যাটাশেরা এ ধরনের দায়িত্ব পালন করেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল, গ্যাটে ইনস্টিটিউট, আমেরিকান/রাশিয়ান/ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এ ধরনের তৎপরতায় সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের প্রধান প্রধান শহরে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের রয়েছে নিজস্ব অফিস ও গ্রন্থাগার। স্ব স্ব দেশের সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্যকে তুলে ধরাও উহার অন্যতম কাজ। সাংস্কৃতিক কূটনীতি দু'দেশের মধ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যোগসূত্র ঘটাতে প্রয়াস পায়। যেমন: দেশ ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সংযোগ কর্মসূচি (Link Programme)। এছাড়াও সাংস্কৃতিক কূটনীতির অংশ হিসেবেই বাংলাদেশ তার বিভিন্ন দূতাবাসে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সেমিনারের আয়োজন করে থাকে।

❑ চেকবুক ডিপ্লোমেসি (Checkbook Diplomacy)

সাধারণত উন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সাহায্য ও বিনিয়োগ করে নিজের বলয়ে নিয়ে আসার নামই চেকবুক কূটনীতি। বর্তমানে অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে কোনো দেশকে কাছে টানতে চাওয়ার কূটনীতিই হলো চেকবুক কূটনীতি। এই কূটনীতি ধারণার উদ্ভব হয়েছে মূলত চীন তার প্রতিবেশী দেশগুলোর অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করাকে লক্ষ্য করেই চেকবুক কূটনীতির মাধ্যমে চীন তার কৌশলগত ও সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করছে। এ কূটনীতিকে আবার Debt Trap Diplomacy বলা হয়।

উদাহরণ:

- ✓ ২০১৭ সালের চীন-পাকিস্তান ইকোনোমিক করিডোরে (CPEC) চীন ৬২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। চীনের কাছে একটি বন্দর হস্তান্তর করছে ইসলামাবাদ। একটি নৌ-ঘাঁটি নির্মাণের জন্য ভূমি সমর্পণ করেছে।
- ✓ বিভিন্ন অবকাঠামো খাতে শ্রীলঙ্কাকে ৯ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে চীন। পাকিস্তানের মতোই শ্রীলঙ্কা তার হাম্বানটোটা বন্দরকে চীনের নিকট ৯৯ বছরের জন্য লিজ দিয়েছে।

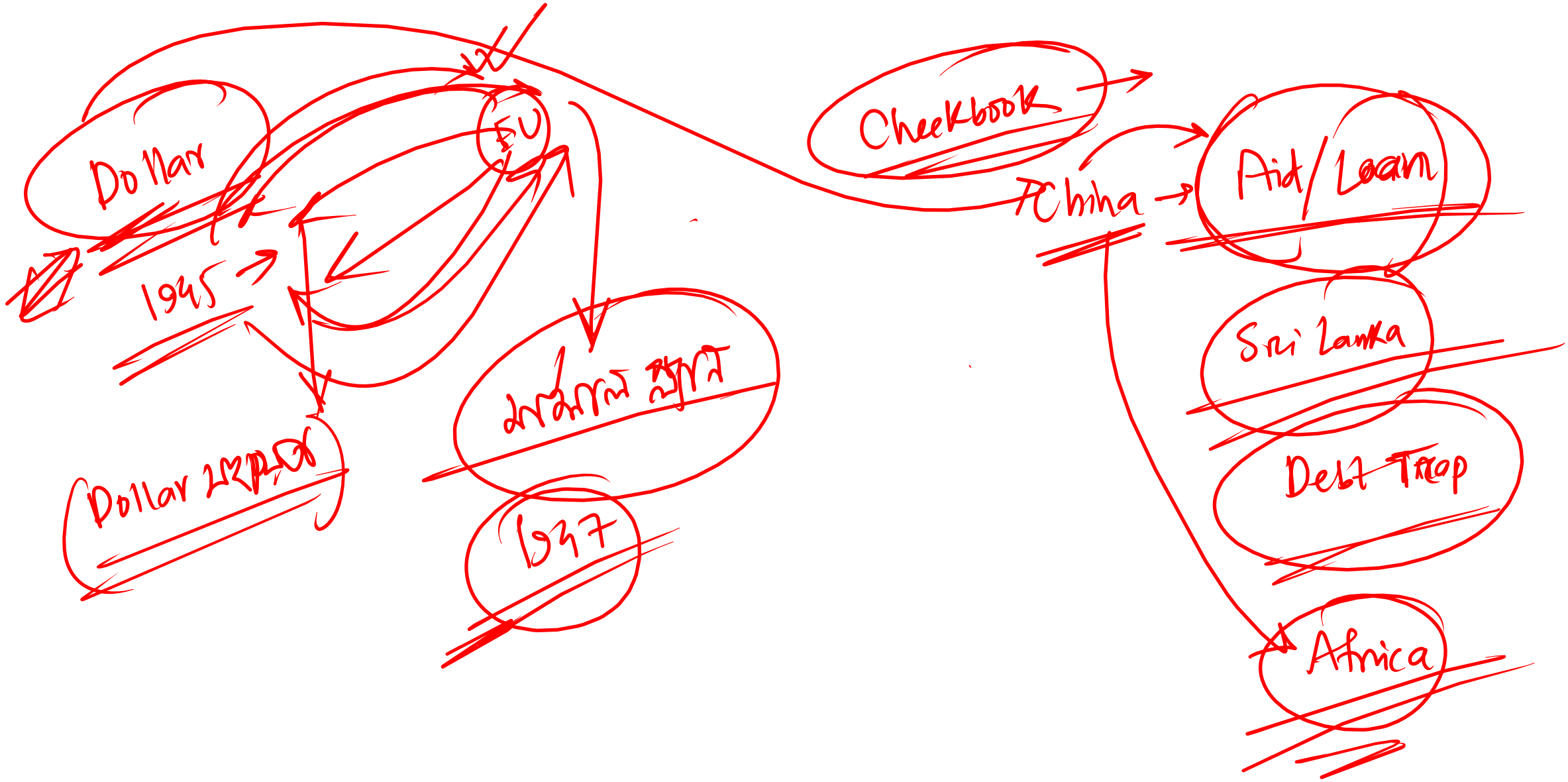

Dollar
1945
EU
Dollar
มาตรการ
1947
Checkbook
China
Aid/Loan
Sri Lanka
Debt Trap
Africa

❑ ডলার কূটনীতি (Dollar Diplomacy)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির একটি দিক হলো ডলার কূটনীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন ব্যবসা বাণিজ্য, তথা সমগ্র মার্কিন অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বার্থে এবং প্রভাববলয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী', 'অনুন্নত বিশ্বের অর্থনীতির পুনর্গঠন', 'কমিউনিজমের আক্রমণ থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা' ইত্যাদির নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে শত শত কোটি ডলার ঋণ ও সাহায্য প্রদান করে। কার্যত এই ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে মার্কিন পণ্যের একচেটিয়া বাজার বজায় রাখার প্রয়াস চালানো হয় এবং ঋণ বা সাহায্যগ্রহীতা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করা হয়। আর এটিই Dollar Diplomacy বা ডলার কূটনীতি নামে পরিচিত। অনেক অর্থনীতি বিশ্লেষক Dollar Diplomacy ও Checkbook Diplomacy কে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন।

❑ গানবোট কূটনীতি (Gunboat Diplomacy)

সামরিক শক্তি প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বৈরী দেশ বা শক্তিকে হটে যেতে বা দমে যেতে বাধ্য করার কৌশলকেই সাধারণত বলা হয় গানবোট কূটনীতি। এটি মূলত সমুদ্রপথে সংশ্লিষ্ট দেশটির সীমানার আশেপাশে বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ ও নৌবহর পাঠিয়ে চাপে রাখার একটি কৌশল। মূলত দুর্বল ও ছোট দেশগুলোর বিপরীতে এ ধরনের সামরিক শক্তি প্রদর্শন ও আগ্রাসন সম্ভব। উনিশ ও বিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক সামরিক শক্তিধর দেশ এই ধরনের আচরণের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেছে। নৌপথে যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হাইতি, পানামা, কলম্বিয়া এবং নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে এই গানবোট কূটনীতি ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি শীতল যুদ্ধের সময়েও দেশটি লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশের বিপক্ষে এ ধরনের আগ্রাসন প্রদর্শন করেছিল। তাছাড়া, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ৭ম নৌবহর প্রেরণ করতে চেয়েছিল যা গানবোট কূটনীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু রাশিয়ার হস্তক্ষেপে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

☐ পিং পং কূটনীতি (Ping Pong Diplomacy)

১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের একটি টেবিল টেনিস দল জাপানের নাগোয়াতে ৩১তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এসময় মার্কিন টেবিল টেনিস দলকে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারা চীন সফর করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল চৌ এন লাই উক্ত দলকে আপ্যায়ন করেন এবং বলেন "You opened a new phase of relation between PRC and US."

চীনা ভাষায় টেবিল টেনিস খেলাকে বলা হয় "পিং পং"। এ সফরের মধ্য দিয়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ঐতিহাসিক চীন সফরের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এ কূটনৈতিক উদ্যোগই পিংপং কূটনীতি নামে পরিচিতি লাভ করে।

❑ মিডিয়া কূটনীতি

সাধারণত দুটি দেশের মধ্যে বৈরী ও তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ফলে পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতি এবং দূরত্ব তৈরি হয়। একপর্যায়ে যখন সরাসরি আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায় তখন দুই দেশের মিডিয়াই একে অন্যকে অভিযুক্ত করে এবং উত্তেজনাকর তথ্য, সংবাদ প্রচার করতে থাকে। ফলে মিডিয়ার প্রভাবে দুই দেশের উত্তেজনা প্রশমনের বদলে উল্টো বেড়ে যায়। এ ধরনের কূটনীতিকে বলা হয় মিডিয়া কূটনীতি। সাম্প্রতি সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এ কূটনীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

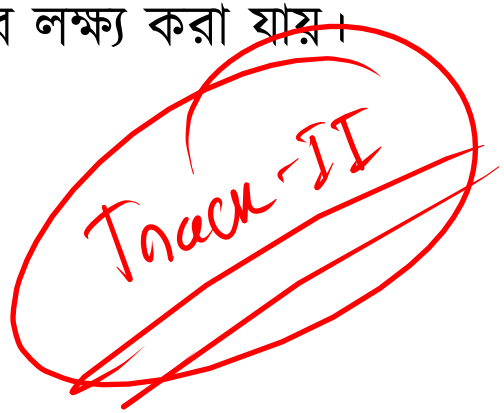

❑ শাটল কূটনীতি (Shuttle diplomacy)

যখন কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ এক দেশ থেকে অন্য দেশে বারবার সফর করেন, তখন তাকে Shuttle diplomacy বলে। যেমন- মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বন্ধের জন্য বারবার ইসরাইল ও মিশর সফর করেন। এ সময় তিনি মিশর ও সিরিয়া এলাকা থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের চেষ্টা চালান। New York Times ১৯৭৪ সালে এ ধরনের সফরের ক্ষেত্রে Shuttle শব্দ প্রথম ব্যবহার করে। তখন থেকে এই ধরনের তৎপরতাকে Shuttle diplomacy বলে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তুরস্ক ঘনঘন মস্কো ও কিয়েভ ভ্রমণ করে। যা Shuttle diplomacy এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

☐ সাইডলাইন কূটনীতি (Sideline Diplomacy)

আন্তর্জাতিক কোনো সম্মেলনের ফাঁকে যদি দ্বিপাক্ষিক কোনো বিষয়ে নিয়ে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা হয় বা সমস্যা সমাধানে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া হয় তাকে সাইডলাইন কূটনীতি বলে।

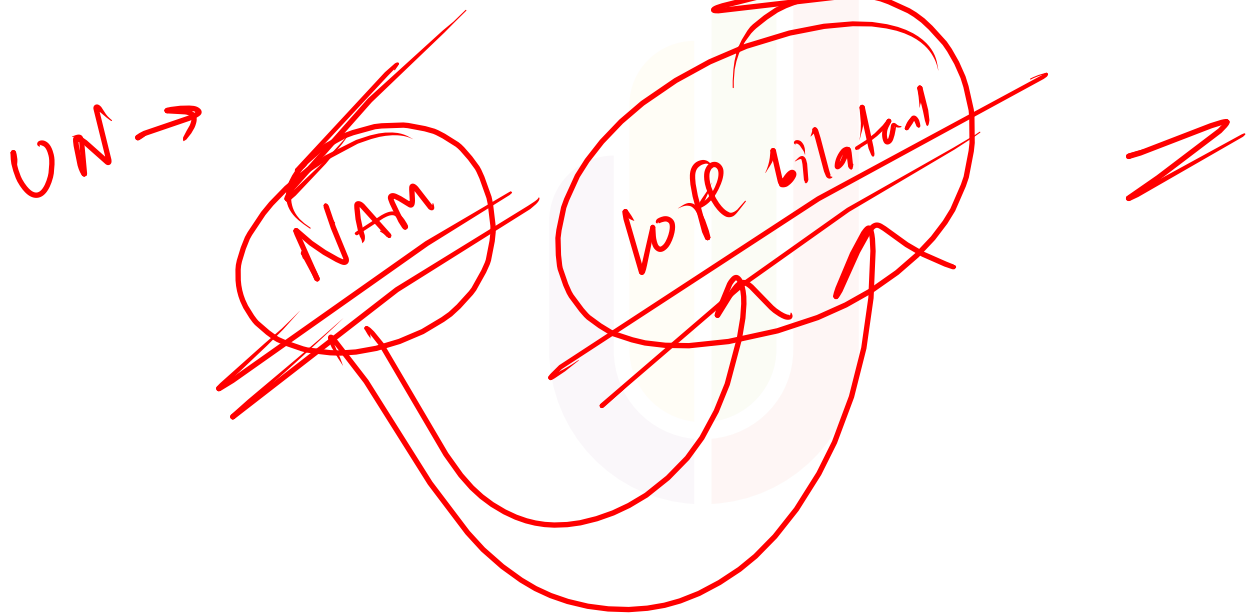

❑ গোপন কূটনীতি

কোনো কূটনৈতিক কোনো বিষয়ে (বিশেষত সংবেদনশীল) প্রকাশ্যে কোনো ভূমিকা না নিয়ে (not taking public positions/postures) ভিতরে ভিতরে আলোচনা করে একে অন্যের মনোভাব জানতে চেষ্টা করা এবং তদনুযায়ী নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হওয়াকে বলে Quiet Diplomacy। নীরব কূটনীতি মূলত বিচক্ষণ আলোচনা বা কর্মের মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য একটি রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা। নীরব কূটনীতি পর্দার আড়ালে কাজ করে এবং খোলামেলা আলোচনার পরিবর্তে ব্যাক ডোর এর উপর নির্ভর করতে পারে। অর্থাৎ জনসাধারণ ও গণমাধ্যমে থেকে আড়াল হয়ে পরিচালিত একটি কূটনৈতিক কৌশল। এতে চুক্তি তৈরি এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও জড়িত থাকতে পারে। নীরব কূটনীতি সুশীল সমাজের সদস্যদের সাথে বৈঠকের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের নেতাদের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাবও রাখতে পারে।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো প্রায়শই নীরব কূটনীতির উপর নির্ভর করে। কারণ তাদের জন্য দেশগুলোকে ভয় দেখানোর জন্য সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তি নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রও নীরব কূটনীতি ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের উক্তিটি নীরব কূটনীতির সাক্ষ্য বহন করে। উক্তিটি হলো – 'Speak Softly and carry a big Stick; you will go far.'

☑ নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি (Wolf Warrior Diplomacy)

বর্তমান সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতে চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধরে রেখেছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে চীন কাউকে তোয়াক্কা করছে না। সাম্প্রতিক সময়ে কূটনৈতিক অঙ্গনে চীনের মুখপাত্ররা আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর, বেশি আক্রমণাত্মক এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও অনেক বেশি সক্রিয়। চীনের এরকম মনোভাবকে অনেকে নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

নেকড়ে যেমন তার শত্রুকে কখনো ছাড় দেয় না তেমনি চীনের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের যেকোনো তীর্যক মন্তব্যের বিপরীতে চীনও এখন পাল্টা আক্রমণ হিসাবে তীর্যক মন্তব্য ছুড়ছে, কোনো রকম ছাড় দিচ্ছে না কাউকে। চীনের এ আক্রমণাত্মক জবাবকে নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি বা Wolf Warrior Diplomacy বলা হয়।

যেমন: ৩ আগস্ট, ২০২২ ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ান সফরে আসলে চীন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে "চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা চীন কোনো ভাবেই মেনে নিবে না"।

❑ **কূটনীতির বিভিন্ন স্তর :** কূটনীতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে রয়েছে- ট্র্যাক-১ কূটনীতি, ট্র্যাক-২ কূটনীতি, ট্র্যাক-৩ কূটনীতি, দ্বৈত ট্র্যাক কূটনীতি ও মাল্টি ট্র্যাক কূটনীতি।

ট্র্যাক-১ কূটনীতি (Track-I Diplomacy)	Track-I কূটনীতি বলতে বোঝায় গতানুগতিক সরকারি কূটনীতি। এক দেশের সরকারি কর্মকর্তা অন্যদেশের সরকারি কর্মকর্তাগণের সাথে যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায় সেটাই Track-I কূটনীতি। উদাহরণ: প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাঝে কূটনৈতিক আলোচনা।
ট্র্যাক-২ কূটনীতি (Track-II Diplomacy)	Track-I কূটনীতি ব্যর্থ হলে সরকারের পাশাপাশি বিবাদ মিটাতে সুশীল সমাজ, যেমন: মিডিয়া, চার্চ বা ধর্মীয় গোষ্ঠী, মহিলা সংগঠন, শিক্ষা সংগঠন ইত্যাদি সংস্থার পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাকে বলা হয় Track-II Diplomacy। সুশীল সমাজের এ উদ্যোগ মূলত আস্থা সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করে। একে Back Channel Diplomacy ও বলা হয়।

ট্র্যাক-৩ কূটনীতি (Track-III Diplomacy)	দুইটি পক্ষের বিবাদ মীমাংসায় তৃতীয় কোনো পক্ষ যদি আলোচনায় অংশ নেয় তখন তা Track-III কূটনীতি হয়। দাতা গোষ্ঠীসমূহ যেমন: বিশ্বব্যাংক, ADB, JICA, ফোর্ড ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থা যখন বিরাজমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিবাদ নিরসনে আস্থা সৃষ্টিকারী হিসেবে উদ্যোগ নেয়, তখন তাকে বলা হয় Track-III Diplomacy. উদাহরণ: ADB ব্যাংক এর বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা।
দ্বৈত ট্র্যাক কূটনীতি (Dual Track Diplomacy)	প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনার পাশাপাশি সামরিক মহড়ার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শনই (Dual Track Diplomacy) দ্বৈত কূটনীতি। ২০১২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরানের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে (Dual Track Strategy) দ্বৈত কৌশল গ্রহণ করেন এবং এই কৌশলে সফলতাও আসে ২০১৫ সালে। ইরানের সাথে আলোচনা এবং একইসাথে পারস্য উপসাগরে মার্কিন ৫ম নৌবহরের (মিনা সলোমন) সামরিক সাজসজ্জার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন ছিল দ্বৈত কৌশল। যা পরবর্তীতে Dual Track Diplomacy হিসেবে পরিচিতি পায়। ২০১৫ সালে এরূপ কূটনীতির মাধ্যমে ইরানের সাথে ১০ বছর মেয়াদি পরমাণু সমঝোতার জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল Joint Comprehensive Plan of Action.
বহুমাত্রিক কূটনীতি (Multi-Track Diplomacy)	বিভিন্নমুখী কূটনৈতিক উদ্যোগকে (Track - I, II, III) যখন বিভিন্ন ট্র্যাকে একই সাথে চালিয়ে যাওয়া হয় তখন তাকে Multi Track কূটনীতি বলা হয়। উদাহরণ: ধরা যাক, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছেন। একই সাথে বাংলাদেশের ড. রেহমান সোবহান ও ভারতের অভিজিৎ ব্যানার্জি যদি একই বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকেন সেটাই হবে Multi Track কূটনীতি।

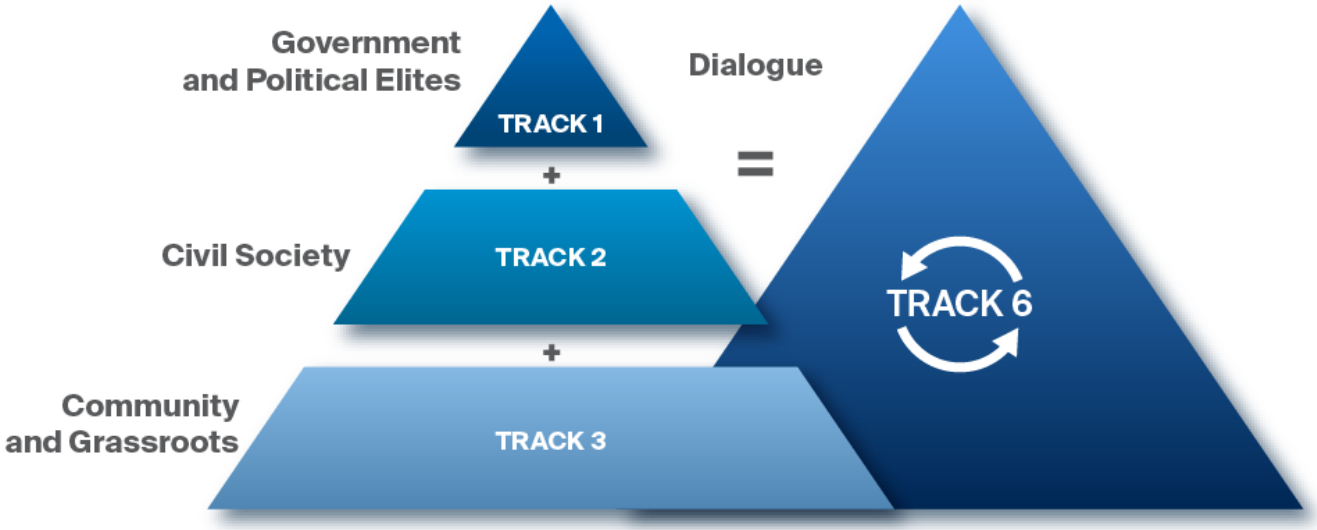

❑ কূটনৈতিক মিশন/ কূটনীতিকের কাজ

Vienna Convention on Diplomatic Relation-1961 এর অনুচ্ছেদ-৩ অনুসারে একজন কূটনীতিক/কূটনৈতিক মিশন যে কাজগুলো করে থাকে –

অনুচ্ছেদ -৩ (১) গৃহীত রাষ্ট্রে প্রেরিত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা।
অনুচ্ছেদ -৩ (২) আন্তর্জাতিক আইন মেনে গৃহীত রাষ্ট্রে প্রেরিত রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।
অনুচ্ছেদ -৩ (৩) গৃহীত রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালানো।
অনুচ্ছেদ -৩ (৪) গৃহীত রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে প্রেরিত রাষ্ট্রে প্রতিনিয়ত তথ্য হালনাগাদ করা।
অনুচ্ছেদ -৩ (৫) গৃহীত রাষ্ট্রের সাথে প্রেরিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো।

কূটনীতিক সুবিধা ও দায়মুক্তি

১৮ এপ্রিল, ১৯৬১ স্বাক্ষরিত ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশন এর ৩১-৩৪ অনুচ্ছেদে কূটনৈতিকদের অধিকার ও দায়মুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। অধিকার বা দায়মুক্তিগুলো হলো –

- ✓ একজন কূটনৈতিক স্বাগতিক দেশে সেদেশের একজন প্রথম শ্রেণির নাগরিকের মতো প্রয়োজনীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করবেন।
- ✓ স্বাগতিক দেশের রাজস্ব ও মিউনিসিপ্যাল কর থেকে অব্যাহতি পাবেন।
- ✓ স্বাগতিক দেশের ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি পাবেন।
- ✓ কূটনৈতিক মিশনের নথিপত্র তল্লাশি বা আটক করা যাবে না।
- ✓ কূটনৈতিক প্রতিনিধি স্বাগতিক দেশে নিজের ও পরিবারবর্গের জানমালের নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হবেন।
- ✓ কূটনৈতিককে স্বাগতিক দেশ গ্রেফতার বা আটক করতে পারবে না। স্বাগতিক দেশ যথাযথ সম্মান সহকারে কূটনীতিকের সাথে আচরণ করবে এবং তাঁর দেহ, স্বাধীনতা বা মর্যাদার ওপর যে কোনো আক্রমণ রোধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ✓ কূটনীতিকের বাসস্থান কূটনৈতিক মিশনের মতোই যথাযথভাবে স্বাগতিক দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত হবে।

❑ কূটনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা

➢ হাইকমিশনার ও অ্যাম্বাসেডর

হাইকমিশনার ও অ্যাম্বাসেডর হলো একটি দেশ কর্তৃক অন্য একটি দেশে প্রেরিত প্রবীণ কূটনীতিক বা রাষ্ট্রদূত। কমনওয়েলথভুক্ত একটি দেশ অন্য একটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশে যে কূটনীতিক প্রেরণ করে, তাকে বলা হয় হাইকমিশন। হাই কমিশনের প্রধান কর্তা ব্যক্তি বা কূটনীতিককে বলা হয় হাইকমিশনার। পক্ষান্তরে কমনওয়েলথভুক্ত দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশ বা আন্তর্জাতিক সংগঠনে কোনো কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করা হলে বলা হয় অ্যাম্বাসি (embassy)। অ্যাম্বাসির প্রধান ব্যক্তি বা প্রধান কূটনীতিককে বলা হয় অ্যাম্বাসেডর। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রে বা জাতিসংঘে বাংলাদেশের দূতাবাসের প্রধানকে বলা হয় অ্যাম্বাসেডর বা রাষ্ট্রদূত এবং যুক্তরাজ্যে বা ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাসের প্রধানকে বলা হয় হাইকমিশনার।

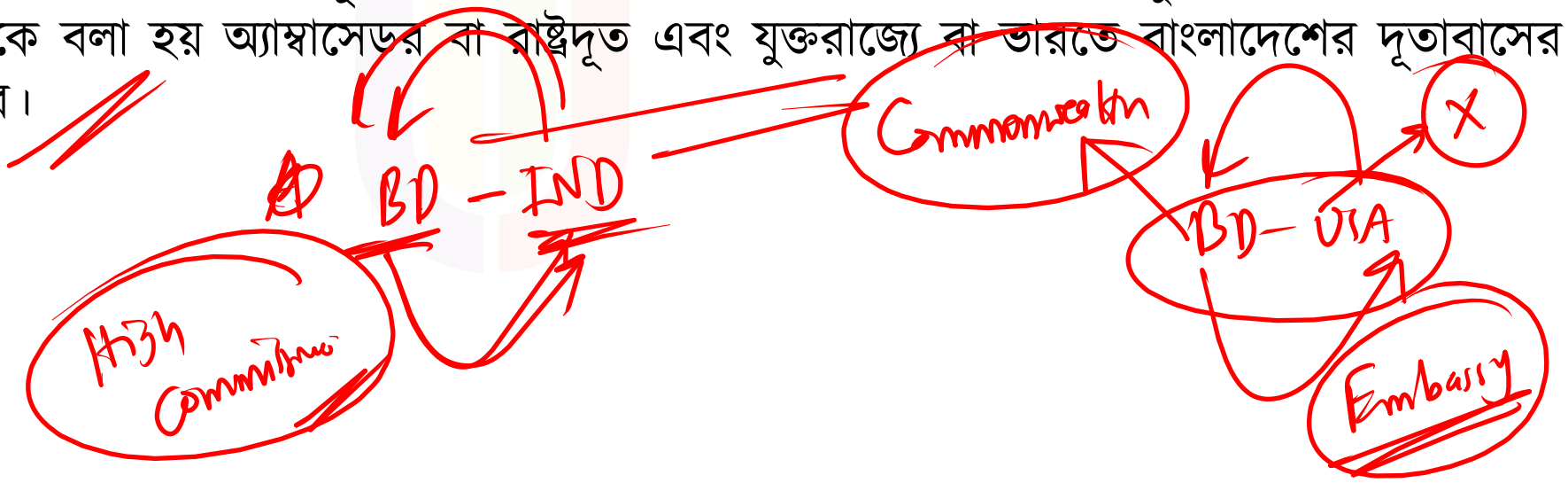

➢ Persona non grata

Persona non grata একটি ল্যাটিন ভাষা যার আক্ষরিক অর্থ অবাঞ্ছিত ও অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। কূটনীতিতে Persona non grata বলতে এমন বহির্দেশীয় ব্যক্তিকে বোঝায় যার নির্দিষ্ট কোনো একটি রাষ্ট্রে অবস্থান ও প্রবেশ ঐ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংক্ষেপে পার্সোনা নন গ্রাটা বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি গ্রাহক রাষ্ট্র কর্তৃক অগ্রহণযোগ্য ও অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছে, এ ধরনের ব্যক্তি অবাঞ্ছিত বলে ঘোষিত হলেই ঐ দেশ থেকে প্রত্যাহারযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

➤ **Attache**

অ্যাটাশে সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

- নৌ, সামরিক, বিমান কিংবা বাণিজ্যিক অ্যাটাশে।
- রাজনৈতিক অ্যাটাশে
- কালচারাল অ্যাটাশে

➢ যুক্তরাষ্ট্রকে সংঘাত থেকে দূরে রাখার মনরো ডকট্রিন

১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো মার্কিন স্বার্থে যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিল তাই মনরো ডকট্রিন নামে পরিচিত। এই নীতির মূল বক্তব্য ছিল মার্কিনিরা নিজ ভৌগোলিক সীমার বাইরে অন্যকোনো রাষ্ট্রকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না এবং অন্যকোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। তারা ইউরোপের কোনো প্রকার রাজনীতিতে অংশ নেবে না। অর্থাৎ মনরো নীতির উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। এ কারণে মনরো ডকট্রিনকে Policy of Isolation বা বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি বলে অভিহিত করা হয়।

➢ যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার নীতি থেকে বের হয়ে আসতে ট্রুম্যান ডকট্রিন

সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য হ্রাস এবং সমাজতন্ত্রের প্রভাব রোধ করতে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো নিয়ে NATO (1949) গঠন করে। হ্যারি. এস. ট্রুম্যান কমিউনিজম প্রতিরোধে মধ্যপ্রাচ্যে CENTO জোট এবং দক্ষিণ এশিয়ায় SEATO জোট গঠন করেছিলেন, ট্রুম্যানের এইসব নীতির কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আর ট্রুম্যানের এই পররাষ্ট্রনীতিই ইতিহাসে, ট্রুম্যান ডকট্রিন নামে পরিচিত।

➢ ইউরোপ পুনর্গঠনের জন্য মার্শাল প্লান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা ও ভূমিকা মার্শাল প্লান (European Recovery Program) নামে পরিচিত। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জর্জ মার্শাল এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ৫ জুন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর বিখ্যাত মার্শাল প্লান ঘোষণা করেন। মার্শাল বলেছিলেন, "It is logical that The United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health to the world without which there can be no political stability and no assured peace." তিনি আরো বলেছিলেন যে, "যেখানে দারিদ্র্য, হতাশা ও লোকসংখ্যা বেশি সেখানেই কমিউনিজম শাখা প্রশাখা ছড়ায়। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দারিদ্র্য দূর না করলে ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না"। তাঁর এ পরিকল্পনা ছিল মূলত পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার সম্প্রসারণ প্রতিরোধে একটি কর্মসূচি। ট্রুম্যান নীতির পরিপূরক ছিল মার্শাল প্ল্যান। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Plan is not withstanding its apparent novelty only a repetition of the Truman plan for political pressure with the help of dollars." ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী ৪ বছর এই পরিকল্পনা কার্যকর থাকে। মার্শাল প্ল্যানের অধীনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য লাভ করে ইংল্যান্ড (২৬%) এর পরে ফ্রান্স (১৮%) ও তৃতীয় অবস্থানে পশ্চিম জার্মানি (১১%)।

❑ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিজমের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য

➢ ডমিনো থিওরি

ডমিনো থিওরি ১৯৫০'র দশক থেকে ১৯৮০'র দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক পররাষ্ট্রনীতি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিজমের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেভিড আইজেনহাওয়ার এই তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। ডমিনো তত্ত্বের মূলকথা ছিল, কোনো একটি রাষ্ট্রে যদি সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে পাশের রাষ্ট্রটিও সমাজতন্ত্রীদের দখলে চলে যাবে।

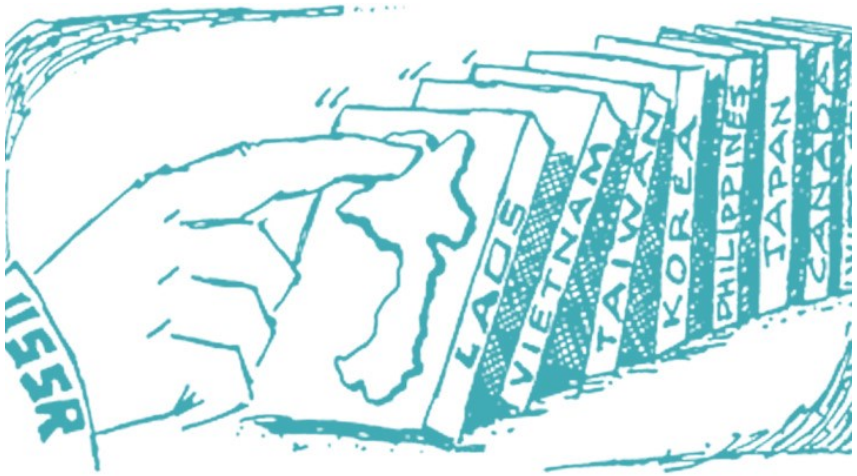

➢ সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সংস্কারে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা

১৯৮০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ কর্তৃক গৃহীত একটি রাজনৈতিক সংস্কার নীতি হচ্ছে গ্লাসনস্ত। গ্লাসনস্ত অর্থ হলো 'খোলামেলা আলোচনা'।

পেরেস্ত্রৈকা হলো আশির দশকে (১৯৮৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি। পেরেস্ত্রৈকা শব্দের অর্থ 'পুনর্গঠন'।

➢ চুক্তি

দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানত লিখিত আকারে সম্পাদিত এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেকোনো শিরোনামযুক্ত আন্তর্জাতিক ঐকমত্য, যা একটি কিংবা দুই বা ততোধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দলিলে আবদ্ধ, তাকে চুক্তি বলে।

➢ চুক্তির প্রয়োজনীয়তা

- চুক্তির মাধ্যমে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি হয়। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও দায়দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে।
- চুক্তি zero-sum-game-এর পরিবর্তে win-win game-এর পরিবেশ তৈরি করে।
- চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কারিগরি নৈপুণ্য ইত্যাদি বিনিময় হয়, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বিত ও টেকসই সম্পর্ক সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন হয়।
- চুক্তি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বৈশ্বিক রাজনীতিসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমেই বিশ্ব পরিমণ্ডলে পারস্পরিক আদান-প্রদান, নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, যোগাযোগ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চুক্তি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শুধু partnership সৃষ্টি করে না, benefit and risk ভাগাভাগির দ্বার উন্মোচন করে।
- চুক্তি সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে Potentiality of conflict-এর পরিবর্তে Potentiality of cooperation-এর ক্ষেত্র তৈরি করে।

চুক্তির প্রকারভেদ

Treaty: Treaty সাধারণত পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। এর বিষয়বস্তু বা পরিধি ব্যাপক এবং সাধারণত সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

Convention: Convention সাধারণত বহুপাক্ষিক চুক্তি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। এর বিষয়বস্তু বা পরিধি ব্যাপক। সাধারণত Convention সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

Agreement: Treaty বা convention-এর চেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতায় সম্পাদিত হয় এবং সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান পর্যায়ে স্বাক্ষরিত হয় না। Treaty ও Convention-এর তুলনায় কমসংখ্যক পক্ষ এবং সীমিত পরিধির চুক্তির ক্ষেত্রে এই নামটি ব্যবহৃত হয়। সরকারের বিভিন্ন Ministry বা Division-এর প্রধান এবং কারিগরি ও প্রশাসনিক চরিত্রের Agreement -এর ক্ষেত্রে Head of the department কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

- **Protocol: Protocol ৪টি অর্থে ব্যবহৃত হয়:**
  - ✓ রাষ্ট্রাচার অর্থে (State behavior);
  - ✓ পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি অর্থে
  - ✓ যেকোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির (Treaty, Agreement) খসড়া অর্থে;
  - ✓ মূল চুক্তির কোনো Technical দিক বাস্তবায়ন করার জন্য ঐ চুক্তির অধীনে সম্পাদিত সম্পূরক বা পরিপূরক চুক্তি অর্থে।

মূলত, Protocol-Treaty, Agreement বা Convention-এর অতিরিক্ত অংশ। Head of the ministry or division-প্রধান এবং Attached department-এর ক্ষেত্রে Department-প্রধান কর্তৃক কম আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

- ✓ **MOU (Memorandum of Understanding):** MOU-হলো Less informal ঐকমত্য। অনেকটা Non-binding প্রকৃতির। Head of the ministry or Head of the division কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। MOU যদি কারিগরি বা প্রশাসনিক প্রকৃতির হয়, সে ক্ষেত্রে Head of the department কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এদের মূল লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ। একে আবার Gentalmen's Agreement বলা হয়।

- ✓ **Alfred T. Mahan- এর ভাষায়–** "Self interest is not only legitimate but a fundamental cause for foreign policy. It is vain to expect govt. to act continuously on any other ground than national interest."

❑ **বহিঃসমর্পণ চুক্তি (Extradition) :** বহিঃসমর্পণ চুক্তি (Extradition) : আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোনো বিধান নেই যা দ্বারা অন্য রাষ্ট্রকে বহিঃসমর্পণে বাধ্য করা যাবে। তবে বহিঃসমর্পণ চুক্তির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রকে বহিঃসমর্পণ করতে পারবে। যেমন: বাংলাদেশ ভারত ও থাইল্যান্ডের সাথে বহিঃসমর্পণ চুক্তি করেছে।

➢ **বহিঃসমর্পণ বা অপরাধী প্রত্যর্পণের শর্তসমূহ**

✓ অনুরোধকারী রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত নোটিশ দিতে হবে।
✓ প্রত্যর্পণের পূর্বে করা অন্য ফৌজদারি অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না।
✓ প্রত্যর্পণ ব্যক্তির জাতীয়তা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
✓ অনুরোধকারী রাষ্ট্রে অপরাধীকে যে শাস্তি দিয়েছে তা গ্রাহক রাষ্ট্রে আইনেও সমান মর্যাদা পাবে।
✓ প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন কখনোই বহিঃসমর্পণের বাধ্য বাধকতা সৃষ্টি করে না।
✓ বহিঃসমর্পণ চুক্তিটি সবসময় দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উপর্যুক্ত চুক্তিসমূহ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও কিছু Soft ধরনের চুক্তি; যেমন: Modus Vivendi, Process Verbal-সহ অনেক ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তিসমূহ Less formal এবং non-binding ধরনের।

Extradition

i) আইন → both's same

ii) অপরাধী/অপরাধ → same অপরাধ

BD- India / Thailand

Refugee

Asylum

Internati. court

মুক্ত বাণিজ্য

মুক্তবাজার অর্থনীতি

মুক্তবাজার অর্থনীতিকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Open Market Economy'। 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' এমন এক ধরনের বাজার ব্যবস্থা যেখানে সরকারি সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে। এটাকে কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থনীতি হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিশেষ অধিকার রক্ষিত হয়।
৮০'র দশক থেকে মূলত বিশ্বব্যাংক এবং আই.এম.এফ এর উদ্যোগে তৃতীয় বিশ্বজুড়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ৯০'র দশকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পতন তথা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটেছে।

বৈশিষ্ট্য

- ✓ মুক্তবাজার অর্থনীতির মূল উপাদান হলো পণ্য ক্রয়ে ক্রেতার নিজস্ব পছন্দের অধিকার।
- ✓ পণ্য ও শ্রম বিক্রয়ে এবং ব্যবসা কাঠামোতে উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।
- ✓ কোনো রকম সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা বাধ্যবাধকতা না থাকায় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল ব্যবসায়ে আগ্রহী হয়।
- ✓ বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কালে প্রতিযোগিতার কারণে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বজায় থাকে।
- ✓ সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ সীমিত করা হয়।
- ✓ লেনদেনের জন্য স্বাধীনতা ও বাজারের গুরুত্ব থাকে।
- ✓ মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে আমদানি ব্যয় এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়।
- ✓ ভর্তুকি, কর-রেয়াত ইত্যাদি না থাকার কারণে রাষ্ট্রের অর্থ সাশ্রয় হয়।

মুক্ত বাণিজ্য

❑ মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবিধাসমূহ

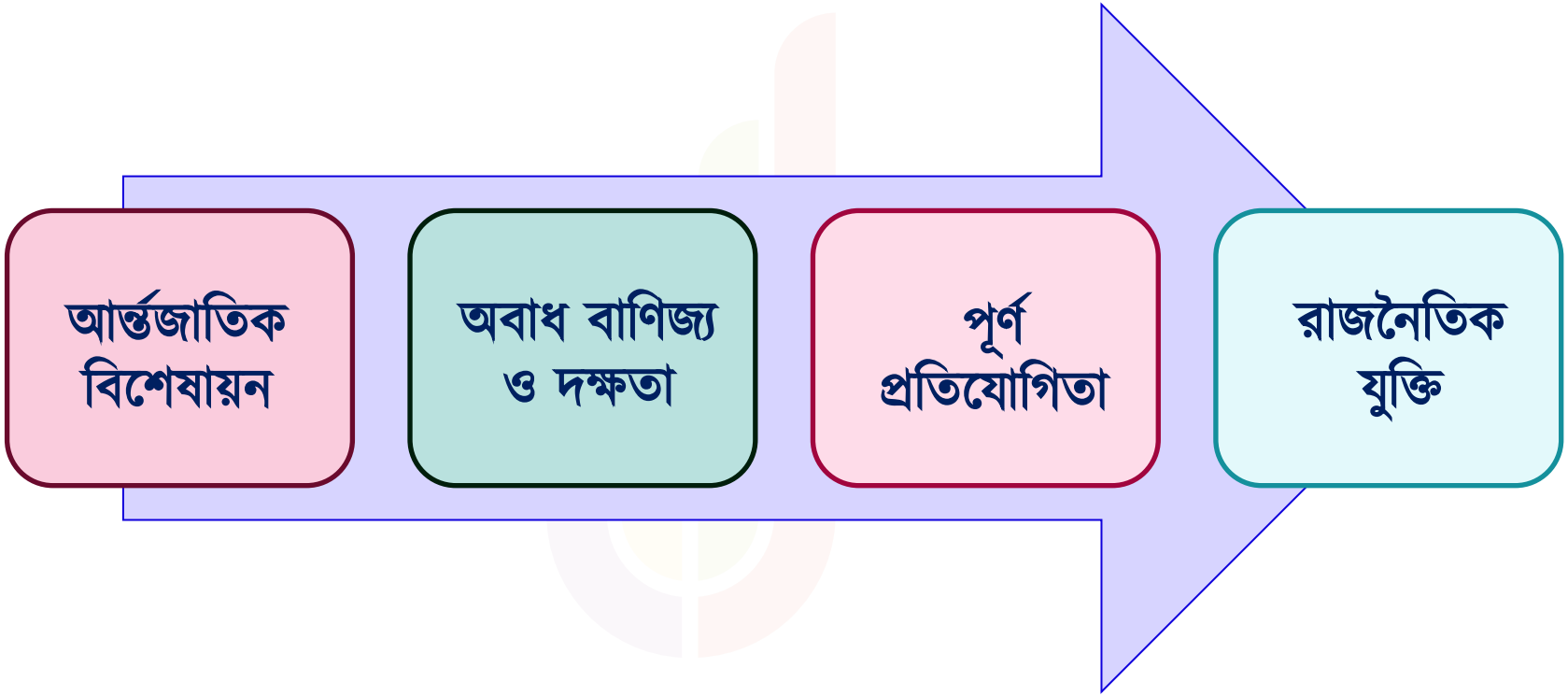

মুক্ত বাণিজ্য

❑ মুক্তবাজার অর্থনীতির অসুবিধা

- বাণিজ্য শর্ত
- দেশীয় বাজার ব্যর্থতা
- অনুন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে যুক্তি

বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই)

❑ বাংলাদেশের কিছু বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সুবিধা

- ✓ ১০০ ভাগ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ;
- ✓ স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পাবলিক কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা তালিকাভুক্ত বিনিয়োগ;
- ✓ 'One stop' সার্ভিস;
- ✓ অবকাঠামোগত প্রকল্পে বিনিয়োগ; যেমন- বিদ্যুৎ খাত, তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান, টেলিযোগাযোগ, বন্দর, সড়ক ও জনপথ;
- ✓ সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ক্রয় অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করা;
- ✓ বেসরকারি ইপিজেডে বিনিয়োগ। বেসরকারি উদ্যোগে রপ্তানিমুখী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সেবা প্রদানের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড গঠন।
- ✓ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ। যেমন: ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়া বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ করছে।

❑ বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। অতি অল্প সময়ে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি আসলে প্রমাণ করে, নেতিবাচক রাজনীতির পরও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এ দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনাগুলো–

- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- মানবসম্পদ উন্নয়ন
- কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন
- কর অবকাশ সুবিধা প্রদান
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা
- ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস
- ভাবমূর্তি উন্নয়ন

বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই)

❑ বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা

- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
- উগ্রবাদ
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা
- অবকাঠামোগত সমস্যা
- অদক্ষ শ্রমিক
- বাজারের সংকীর্ণতা
- শ্রমিক অসন্তোষ
- দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাব
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

জাতিসংঘ

জাতিসংঘ সচিবালয় (United Nations Secretariat)
সাধারণ পরিষদ (The General Assembly)
অছি পরিষদ (The Trusteeship Council)
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)
নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)
আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)

❑ সাধারণ পরিষদ (The General Assembly)

➢ সাধারণ পরিষদের কার্যাবলি (Functions of the General Assembly) :

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ এর কার্যাবলি নিম্নরূপ-

- ✓ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনা ও সুপারিশ করা।
- ✓ আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনা, তবে শর্ত থাকে যে, বিষয়টি নিয়ে ইতঃপূর্বে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হয়নি এবং বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীনও নয়।
- ✓ জাতিসংঘের যেকোনো অঙ্গ সংগঠনের কাজ বা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ও সুপারিশ পেশ করা।
- ✓ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে যেকোনো সুপারিশ পেশ করা, আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়ন, মানবাধিকার, ও সবার জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সুপারিশ করা।
- ✓ নিরাপত্তা পরিষদসহ সংগঠনের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট গ্রহণ করা ও সেই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা।
- ✓ জাতিসংঘের বাজেট নিয়ে আলোচনা ও তা অনুমোদন করা। সদস্য দেশগুলোর চাঁদার হার নির্ধারণ করা।
- ✓ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের ও সেই সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করা। নিরাপত্তা পরিষদের সাথে এক সাথে আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্যদের নির্বাচিত করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতিসংঘের জন্য একজন মহাসচিব নির্বাচিত করা।
- ✓ আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এমন কোনো কাজে বা দেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ যদি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ পদক্ষেপ নিতে পারে।

❑ নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

➢ নিরাপত্তা পরিষদের গঠন (জাতিসংঘ সনদের ২৩ নং অনুচ্ছেদ)

১৫ সদস্য

- **স্থায়ী সদস্য- ৫ (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন)**
- **অস্থায়ী সদস্য- ১০**

✓ অস্থায়ী সদস্য দেশগুলো সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। ১০টি অস্থায়ী সদস্যের আঞ্চলিক বণ্টন এ রকম–

অঞ্চল	সদস্য সংখ্যা	অঞ্চল	সদস্য সংখ্যা
এশিয়া মহাদেশ	২টি	পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য	২টি
আফ্রিকা মহাদেশ	৩টি	পূর্ব ইউরোপ	১টি
ল্যাটিন আমেরিকা	২টি		

❑ ভোট ও প্রস্তাব পাশ:

✓ নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি করে ভোট রয়েছে।

✓ নিরাপত্তা পরিষদের কোনো প্রস্তাব পাস করতে হলে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যসহ মোট ৯টি সম্মতিসূচক ভোটের প্রয়োজন হয়।

✓ কোনো স্থায়ী সদস্য প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। তবে, স্থায়ী কোনো সদস্য যদি উপস্থিত থেকে ভোট দানে বিরত থাকে তাহলে প্রস্তাব পাশ হবে।

✓ কিন্তু উপস্থিত না থাকলে প্রস্তাব পাশ হবে না।

❑ ভেটো প্রদান ক্ষমতা:

✓ ভেটো শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ হচ্ছে আমি মানি না।

✓ ভেটো হচ্ছে এক-পক্ষীয়ভাবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, দেশের মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত বা আইনের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করা।

✓ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া এবং ফ্রান্স - এই পাঁচটি দেশ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য।

✓ তারা প্রত্যেকেই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

❑ নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব

নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব জাতিসংঘ সনদের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ১২তম অধ্যায় তথা ২৪, ২৫, ২৮, ৩০ এবং ৪০-৫৪ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এর দায়িত্বসমূহ আলোচনা করা হলো:

- ✓ **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্ব:** আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সকল সদস্যের পক্ষ হতে এ দায়িত্ব পালন করবে।
- ✓ **শান্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ:** আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টিকারী যেকোনো সমস্যা বা অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা এবং তার মীমাংসার পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ করা নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব। যদি কোথাও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে যেকোনো সদস্য দেশ সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে বা জাতিসংঘ মহাসচিবের মাধ্যমে তা নিরাপত্তা পরিষদের গোচরে আনতে পারে।
- ✓ **শান্তিভঙ্গ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত দায়িত্ব:** কোথাও শান্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ বা আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপ চিহ্নিত করা গেলে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- ✓ **অর্থনৈতিক অবরোধ:** আগ্রাসনকারী দেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ অর্থনৈতিক অবরোধসহ অন্যান্য অবরোধ এমনকি প্রয়োজনে বল প্রয়োগে সে দেশকে শান্তি স্থাপনে বাধ্য করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে।

- ✓ **সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ:** অন্যান্য ব্যবস্থা অকৃতকার্য হলে নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনে সামরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সকল সদস্য দেশ নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকে।
- ✓ **আঞ্চলিক বন্দোবস্ত বিষয়ক দায়িত্ব:** বন্দোবস্তের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য উৎসাহ দান এ পরিষদের একটি দায়িত্ব। বিরোধের সাথে জড়িত রাষ্ট্রের উদ্যোগে বা নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে আঞ্চলিক বন্দোবস্ত বা এজেন্সির মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা যায়।
- ✓ **অছি বিষয়ক দায়িত্ব:** যে সকল অছি এলাকা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, সেগুলোর সকল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এসব অছি এলাকার চুক্তি অনুমোদন, সম্পদের উপর অধিকার স্থাপন, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব স্থাপন, সেগুলোর সকল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এসব অছি এলাকার চুক্তি অনুমোদন, পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ অছি পরিষদের নিকট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা নিতে পারে।
- ✓ **নতুন সদস্য গ্রহণ:** জাতিসংঘের নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সাধারণত সবার সাথে যৌথভাবে নিরাপত্তা পরিষদ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ নতুন সদস্য গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।
- ✓ **নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব:** নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ যৌথভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচন করে থাকে। এ পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নির্বাচন করে থাকে।
- ✓ **সনদ সংশোধন:** শুধু নিরাপত্তা পরিষদই জাতিসংঘ সনদ সংশোধন, পরিমার্জন বা নতুন আইন অন্তর্ভুক্তকরণ করতে পারে।

জাতিসংঘ

ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা
বৃহৎ শক্তির প্রভাব
P5 দেশগুলোর মাঝে বিরোধ
বিরোধ মিমাংসায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ
নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতা

❑ ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কিছু ফলাফল নিম্নরূপঃ-

- ✓ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারছে না।
- ✓ চলমান ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের উপর হত্যাযজ্ঞ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।
- ✓ গণচীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর পরই জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়নি।
- ✓ রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ জাতিসংঘ নিতে পারেনি।
- ✓ সিরিয়ায় আসাদ সরকারের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি।
- ✓ ইয়েমেনে হুতিদের নৃশংসভাবে সৌদি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ নির্বাক।
- ✓ ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লিবিয়ার উপর আক্রমণ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক বতসোয়ানা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ের উপর আক্রমণের নিন্দা প্রস্তাব মার্কিন ভেটোর কারণে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়নি।
- ✓ জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস ঘালির পুনঃনির্বাচন মার্কিন ভেটোর কারণে সম্ভব হয়নি।
- ✓ কোরিয়া যুদ্ধ, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, প্যালেস্টাইন যুদ্ধ প্রভৃতি বহু ঘটনার নিষ্পত্তি কেবল ভেটোর কারণে বাস্তবতার মুখ দেখেনি।

❑ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার

- ➢ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি
  - ✓ মহাদেশভিত্তিক প্রতিনিধি বৃদ্ধি
  - ✓ মুসলিম দেশের প্রতিনিধি রাখা
- ➢ ভেটো পদ্ধতির সংস্কার
- ➢ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দূর ও পরিষদকে আরও কার্যকর করা
- ➢ মহাসচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি
- ➢ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের উত্থান মোকাবিলায় ব্যবস্থা
- ➢ ত্রুটিপূর্ণ চাঁদা পদ্ধতি সংস্কার
- ➢ মার্কিন সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে আনা

❑ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের প্রস্তাবসমূহ

✓ **বুট্রোস ঘালির উদ্যোগ:** ১৯৯২ সালে ড. বুট্রোস ঘালি মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণের পরই জাতিসংঘ সংস্কারের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তারই উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ১৭ জানুয়ারি জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জাতিসংঘকে অধিকতর শক্তিশালী ও গতিশীল করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য An Agenda for Peace কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের সংস্কারের লক্ষ্যে একটি প্যানেল গঠন করা হয়। এই প্যানেল দুটি সংস্কার মডেল উপস্থাপন করে –

প্রথম মডেল	• নতুন স্থায়ী সদস্য হবে ৬টি যাদের ভেটো ক্ষমতা থাকবে না। • ৬টির মধ্যে এশিয়া থেকে ২টি, আফ্রিকা থেকে ২টি, ইউরোপ থেকে ১টি ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ১টি। • ২ বছর মেয়াদি অস্থায়ী সদস্য আরও নতুন ৩টি বৃদ্ধি পাবে। • নতুন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা হবে ২৪টি। • আরব বিশ্ব থেকে একটি স্থায়ী সদস্যের পরিকল্পনা রয়েছে।

দ্বিতীয় মডেল	• ৪ বছরের জন্য ৮টি নতুন সদস্য হবে তবে তা নবায়নযোগ্য। • আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে ২টি করে সদস্য থাকবে। • ২ বছর মেয়াদে একটি অস্থায়ী সদস্যপদের প্রস্তাব করা হয়েছে।

✓ **কফি আনানের প্রস্তাব:** ২০০৫ সালের ২০ মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান একবিংশ শতকে বিশ্বের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জাতিসংঘ যাতে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে সংস্থাটির এ ধরনের উদ্যোগ এটাই প্রথম। কফি আনান বলেন, বৃহৎ শক্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সংস্থাটির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কফি আনান প্রদত্ত সংস্কার প্রস্তাবে দুটি মডেল উল্লেখ করেন–

মডেল-A		
ভৌগোলিক এলাকা	প্রস্তাবিত নতুন স্থায়ী আসন	প্রস্তাবিত অস্থায়ী ২ বছরের আসন
আফ্রিকা	২	৪
এশিয়া-প্যাসিফিক	২	৩
ইউরোপ	১	২
আমেরিকা	১	৪
সর্বমোট	৬	১৩

মডেল-B		
ভৌগোলিক এলাকা	প্রস্তাবিত নতুন স্থায়ী সদস্য	প্রস্তাবিত অস্থায়ী সদস্য
আফ্রিকা	২	৪
এশিয়া প্যাসিফিক	২	৩
ইউরোপ	২	১
আমেরিকা	২	৩
মোট	৮	১১

❑ আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)

আন্তর্জাতিক আদালত ১৫ জন বিচারকের সমন্বয়ে ৯ বছরের জন্য গঠিত হয়। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ পৃথক অধিবেশনে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচিত করে। বিচারকরা একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠিতেই নির্বাচিত হন। কোনো প্রকার জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়। তবে একই রাষ্ট্রের একসঙ্গে দু'জন বিচারক নির্বাচিত হতে পারবেন না। মেয়াদান্তে বিচারকগণ পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন। বিচারকগণ তাদের মধ্য থেকে ৩ বছরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। আদালতের কার্যক্রমে ৯ জন বিচারপতির উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হয়।

❑ আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যাবলি (Functions of International Court of Justice)

- **আবেদনমূলক বিষয়ে এখতিয়ার বা কার্যাবলি:** জাতিসংঘের কোনো সদস্য রাষ্ট্র যদি অপর কোনো সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে এবং সে বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার জন্য আবেদন করে, তাহলে আন্তর্জাতিক আদালত সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসামূলক রায় প্রদান করে থাকে।
- **জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে এখতিয়ার:** জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে যদি কোনো বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে আন্তর্জাতিক আদালত উক্ত বিরোধের আইনগত মীমাংসা প্রদান করে তা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।
- **সন্ধি বা চুক্তিবিষয়ক কার্যাবলি:** জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যদি কোনো বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের সম্মতিক্রমে আদালত এর যথাযথ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে।
- **উপদেশমূলক এখতিয়ার:** আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ক যেকোনো বিষয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ যদি আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট উপদেশ কামনা করে তাহলে আদালত উক্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদানে এগিয়ে আসে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

❑ জাতিসংঘের সাফল্য

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এ পর্যন্ত ৭১টি শান্তি মিশনের (১৬টি চলমান) মাধ্যমে –

- ✓ ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন যুদ্ধ বন্ধ করা।
- ✓ ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংকট মোকাবিলা।
- ✓ ১৯৯১ সালে ইরাক-কুয়েত সংকট মোকাবিলা।
- ✓ ১৯৫০ সালে কোরিয়া সংকট মোকাবিলা।
- ✓ ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধ করা।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

- **উপনিবেশ বিলোপ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা:** জাতিসংঘ কম্বোডিয়া, নামিবিয়া, এল সালভাদর, ইরিত্রিয়া, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব তিমুরসহ ৪৫টি দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ প্রায় ৫০টি দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার ত্রিশ বছরব্যাপী সংঘর্ষের পর ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে এবং সুদানের স্বাধীনতা দেওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- **মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন:** ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের পর রাজনৈতিক, নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত ৮০টি চুক্তি সম্পন্ন করেছে।
- **নারী-পুরুষ বৈষম্যরোধ:** ১৯৭৯ সালে CEDAW (Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against women) প্রতিষ্ঠা হয় এবং কার্যকর হয় ১৯৮১ সালে।
- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:** জাতিসংঘ UNDP, UNICEF, ECOSOC ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। ECOSOC-এর মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে এবং এসব কার্যক্রমে ECOSOC, ১৫টি বিশেষ সংস্থা ও বিভিন্ন কমিশন বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

- **পরিবেশ সংরক্ষণ**
  - ✓ ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোয় জাতিসংঘের উদ্যোগে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
  - ✓ ২০০২ সালে জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের ওপর জাতিসংঘ ধরিত্রী সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ।
  - ✓ প্যারিস সম্মেলনে-১৯৬টি দেশ পরিবেশের উন্নয়ন ও কৌশলপত্র নিয়ে আলোচনা করে।
- **পরমাণু বিস্তার রোধ সংক্রান্ত চুক্তি:** ১৯৫৭ সালে IAEA, ১৯৬৮ সালে NPT, ১৯৯৬ সালে CTBT (৯০টি দেশে পরমাণু চুল্লি পরিদর্শন করে)
- **আন্তঃনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বনির্ভরতা**: জাতিসংঘ প্রায় ৮০টি সদস্যদেশের স্বনির্ভরতা অর্জনে ভূমিকা পালন করে।
- **আন্তর্জাতিক আইন জোরদার:** তিন শতাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনে পরিণত হয়েছে। মানবাধিকার সনদ থেকে মহাকাশ ও সমুদ্র তলদেশে পরমাণু সরঞ্জাম ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন করেছে।
- **আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি:** ইরানের পরমাণু চুক্তি
- **বর্ণবৈষম্যের অবসান:** সাধারণ পরিষদ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **উন্নয়নে অবদান:** MDGs, SDGs, UNDP প্রতিষ্ঠা।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

❑ জাতিসংঘের ব্যর্থতা

- **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ব্যর্থতা:** রাশিয়া-ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ থামানোর জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করলেও পঞ্চশক্তির ভেটো ক্ষমতায় তা ব্যর্থ হয়। আন্তর্জাতিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘ এ সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার কারণে সারা বিশ্ব এখন এর ফল ভোগ করছে।
- **রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ:** দীর্ঘ ৬ বছর ধরে বাংলাদেশ ১১.৫ লাখ রোহিঙ্গাদের বহন করে চলছে। জাতিসংঘের প্রতিটি অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা উত্থাপন করলেও জাতিসংঘ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে এখনো যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারছে না।
- **কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ:** ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর থেকে এখন পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে পারেনি জাতিসংঘ। কাশ্মীর নিয়ে এখনো ভারত, চীন ও পাকিস্তানের মাঝে দ্বন্দ্ব চলমান।
- **নির্বিচারে গণহত্যা রোধে ব্যর্থতা:** বসনিয়া হার্জেগোভিনা, কসোভো, আফগানিস্তান, ইরাক, চেচনিয়া এবং বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা রোধে জাতিসংঘ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।
- গাজায় নির্বিচারে চলমান ইজরায়েলি নৃশংস গণহত্যা থামানোতে ব্যর্থতা।

- **মানবাধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থতা:** বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিসংঘের নীরব বা প্রত্যক্ষ ভূমিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। অনেক দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। যেমন- ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করায় খাদ্য ও ঔষধের অভাবে শিশুমৃত্যু মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকা রেখেছে, যা বিশ্বব্যাপী সমালোচিত হয়েছে।

- **মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ-**

  - **মধ্যপ্রাচ্য:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২ নং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল অধিকৃত ভূ-খণ্ড ছেড়ে দেওয়া কিন্তু ইসরায়েল ছাড়েনি। নিম্নোক্ত সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছে –
    - ✓ আরব বসন্ত (২০১১),
    - ✓ সিরিয়া সংকট (২০১১-বর্তমান),
    - ✓ কুয়েত সংকট ১৯৯০ (ইরাক কর্তৃক আক্রমণ)
    - ✓ আফগান সংকট ১৯৭৯-১৯৮৯ (USSR কর্তৃক আক্রমণ)
    - ✓ আগ্রাসন-রোধ (ইরাক)।
    - ✓ উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জাতিসংঘ ইরাকের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কিন্তু কাজে আসেনি।
    - ✓ ২০০৩ সালে জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা করে।
    - ✓ ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসন।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের Genocide Convention এর ২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নিম্নোক্ত ৫টি অপরাধ গণহত্যা–

- ✓ কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে মেরে ফেলা
- ✓ শারীরিক বা মানসিকভাবে কোনো গ্রুপের মানুষদের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করা।
- ✓ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, যাতে করে কোনো জাতি সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস হয়ে যায়।
- ✓ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গোষ্ঠীর জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ✓ জোরপূর্বক ঐ জাতিগোষ্ঠীর বাচ্চাদের অন্য জাতিগোষ্ঠীতে প্রেরণ করা।

➢ গণহত্যা সংক্রান্ত আইন

১৯৪৬ সালে জাতিসংঘে গণহত্যা সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গণহত্যা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের জন্য আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে ১৯৪৮ সালের, ৯ ডিসেম্বর The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG), or Genocide Convention নামে গণহত্যার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাসহ একে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে গণহত্যা রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা দেয়। এটিই ইতিহাসে গণহত্যাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রথম পদক্ষেপ এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রথম কোনো সর্বজনীন চুক্তি। এই আইনটি ১৯৫২ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।

সর্বজনীন মানবাধিকার

১৯৪৮ সালের, ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে Cranston বলেছেন 'মানবাধিকার হলো এমন এক অধিকার, যা ন্যায়বিচার বা আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করলে ছিনিয়ে নেওয়া বা হরণ করা যায় না।'

❑ জেনেভা কনভেনশন ও এর মূল উদ্দেশ্য

জেনেভা কনভেনশন (Geneva Convention): ১৯৪৯ সালের ১২ আগস্ট বিশ্বের ৫৮টি দেশ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাহতদের সঙ্গে আচরণবিধি ও সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে প্রথম তিনটি জেনেভা কনভেনশনের পরিমার্জন ও সম্প্রসারণ করা হয় এবং এতে চতুর্থ কনভেনশনটি যোগ করা হয়।

ক্রমিক	সাল	উদ্দেশ্য
প্রথম	১৮৬৪	যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি।
দ্বিতীয়	১৯০৬	সমুদ্রস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, অসুস্থ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি।
তৃতীয়	১৯২৯	যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ ও তাদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
চতুর্থ	১৯৪৯	যুদ্ধাবস্থায় বেসামরিক জনগণকে রক্ষার জন্য সম্পাদিত চতুর্থ কনভেনশনকে চারটি রেড ক্রস কনভেনশন নামেও ডাকা হয়।

❑ নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডো (CEDAW)

- ✓ CEDAW এর পূর্ণরূপ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
- ✓ নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদটি সিডো সনদ নামে পরিচিত, যা ১৯৭৯ সালের, ডিসেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।
- ✓ ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়।
- ✓ বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশে বর্তমানে এ সনদটি কার্যকর আছে।
- ✓ এই সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, যা বিভিন্ন সময় নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গ্রহণকৃত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে।

➢ নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রে সিডো সনদের ভূমিকা

- ✓ নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সনদটি প্রতিষ্ঠিত।
- ✓ নারীর মানবাধিকার বিষয়টিও উঠে এসেছে।
- ✓ বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করা হয়েছে। এটি এই সনদে স্বীকার করা হয়।
- ✓ এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে। সিডো সনদে ৩০টি ধারা আছে।
- ✓ প্রথম ১৬টি নারীর প্রতি বৈষম্য কত প্রকারের আছে তা আলোচনা করে।
- ✓ বাকি ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়।
- ✓ নারীর নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫ নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক ‘নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস’ হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।
- ✓ নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘ ৮ মার্চকে বিশ্ব ‘নারী দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

❑ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

➢ **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ৩টি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে –**

✓ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা (Arms Embargo)

✓ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (Economic Sanction)

✓ শক্তি প্রয়োগ (Use of Force)

➢ **সৈন্য প্রেরণে ৩টি শর্ত –**

✓ যে দেশে প্রেরণ হবে তার অনুমতি,

✓ নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি,

✓ যে দেশগুলো স্বেচ্ছায় সৈন্য প্রেরণ করবে তার সম্মতি।

❑ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা

- **নিরাপত্তায়:** কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জাতি যাতে যুদ্ধে নিজেদের সম্পৃক্ত না করে, সেজন্য সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে। শান্তিরক্ষী বাহিনী ঐ অঞ্চলের একটি নিরাপত্তা দেয়াল হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **ঐকমত্য স্থাপনে:** শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান ভূমিকা হলো বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সব ধরনের বিবাদ মিটিয়ে সম্পূর্ণরূপে সমঝোতায় পৌঁছানো যায়।
- **মধ্যবর্তী বাহিনীর দায়িত্ব পালন:** শান্তিরক্ষী বাহিনী বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে মধ্যবর্তী বাহিনীর দায়িত্ব পালন করে, যাদের বাফার বাহিনীও বলা হয়ে থাকে। এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা চলে আসে। যার ফলে নিজেদের মধ্যে সহাবস্থানের সৃষ্টি হবে।
- **নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা:** বিবদমান দুই দেশের মধ্যে যাতে যুদ্ধ লেগে না যায়, সেজন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বাহিনী বিরোধপূর্ণ সীমান্তে অবস্থান নেয়, যাতে দুটি দেশের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

❑ এক নজরে অভিবাসী চুক্তি

- ✓ **আনুষ্ঠানিক নাম**- Global Compact for Safe, Orderly and Legal Migration.
- ✓ পরিচয় নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও বৈধ অভিবাসনের জন্য বৈশ্বিক চুক্তি। এটি অভিবাসনের সর্বোচ্চ আইন।
- ✓ **স্বাক্ষর**- ২০১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে মরক্কোর মারাকেশে ।
- ✓ **গুরুত্ব**- অভিবাসীদের সুরক্ষা ও মানবাধিকার, বৈধভাবে অভিবাসীদের জন্য সুযোগ তৈরি এবং তাদের কাজের সুযোগের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- ✓ **স্বাক্ষর করে**- ১৬০টির বেশি দেশ।
- ✓ **স্বাক্ষর করেনি**- যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ শক্তিশালী বহু দেশ।
- ✓ **চুক্তির লক্ষ্য**- ২৩টি

২০১৮ সালের অভিবাসী সম্মেলনে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে মোট অভিবাসী ২৫.৮০ কোটি যা মোট জনসংখ্যার ৩.৪%। এদের মধ্যে ২০০০ সালের পরে বেড়েছে ৪৯%।

এই সম্মেলনে আরও বলা হয় যে, "জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য দুর্যোগে আগামী বিশ্বে অভিবাসীর ঢেউ উঠবে।"

চুক্তি সম্পর্কে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল ও জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস বলেন, "দুর্ভোগ ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে GCM (Global Compact for Migration) একটি রোডম্যাপ।"

SDGs (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট)

০১ দারিদ্র্য বিমোচন (No Poverty)

০২ ক্ষুধামুক্তি (Zero Hunger)

০৩ সুস্বাস্থ্য (Good health and well being)

০৪ মানসম্মত শিক্ষা (Quality Education)

০৫ লিঙ্গ সমতা (Gender Equality)

০৬ বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (Clean Water and Sanitation)

০৭ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (Affordable and clean Energy)

০৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Decent work and Economic Growth)

০৯ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (Industry, Innovation & Infrastructure)

১০ অসমতা হ্রাস (Reduced Inequalities)

১১ টেকসই নগর ও জনপদ (Sustainable Cities and Communities)

১২ পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন (Responsible Consumption and Production)

১৩ জলবায়ু কার্যক্রম (Climate action)

১৪ জলজ জীবন (Life Below Water)

১৫ স্থলজ জীবন (Life on Land)

১৬ শান্তি, ন্যায় বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (Peace, Justice and strong institutions)

১৭ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারত্ব (Partnership for all Goals)

উন্নয়নশীল বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ECOSOC ১৯৬৪ সালে UNCTAD গঠন করে। ১৯৬৪ সালেই UNCTAD আবার G-77 গ্রুপ গঠন করে যার সদস্যগুলো মূলত উন্নয়নশীল ৭৭টি দেশ (G-77 এর বর্তমান সদস্য-১৩৪টি দেশ) । ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ G-77 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে LDC তালিকাভুক্ত করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ LDC ভুক্ত হয়।

❑ LDC থেকে উত্তরণের শর্ত:

সূচক/LDC থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত	CDP শর্ত	বাংলাদেশের অর্জন	
		২০১৮	২০২১
গড় মাথাপিছু আয় (GNI)	১২৩০ ডলারের বেশি (২০২১ সালে নতুন মানদণ্ড ১২২২ ডলারের বেশি)	১২৭৪ ডলার	১৮২৭ ডলার
মানব সম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ বা তার বেশি	৭৫.২	৭৫.৩
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩২ বা তার কম	২৫.২	২৭.২

[তথ্যসূত্র : United Nationas: Department of Economic and Social Affairs]

➢ চ্যালেঞ্জসমূহ

নভেম্বর, ২০২৬ বাংলাদেশ LDC থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পন করলে অনেকগুলো সুবিধা হারাবে এবং কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে —

- ✓ GSP সুবিধা, কোটা সুবিধা ও শুল্ক সুবিধা হারানোর ফলে বাংলাদেশ তার বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ১৪% বা ৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার হারাতে পারে।
- ✓ পোশাক খাতের বাজার একসেস (Access) হারানোর ফলে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ধারণা করা হচ্ছে পোশাক রপ্তানি ৮-১০% কমে যাবে।
- ✓ LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে LDC নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধাগুলো বা ডিফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্টের জন্য যোগ্য হবে না।
- ✓ ২০২৭ সাল থেকে বাংলাদেশে আর Soft Loan বা স্বল্প সুদের ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে না। ঋণের জন্য বাংলাদেশকে কমপক্ষে ২.২৬% সুদে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
- ✓ বাংলাদেশ Green Climate Fund এর মতো বিশেষ তহবিল হতে অর্থ পাবে না। ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্থিতিস্থাপকতা কমে যাবে। যেহেতু বাংলাদেশ জলবায়ু বিপর্যয়ের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সুতরাং GCF হারানো একটি বড় ধাক্কা হতে পারে।

- ✓ জাতিসংঘের প্রযুক্তি ব্যাংক স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সহায়তা দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে তারা বাংলাদেশকে আর সহায়তা করবে না।
- ✓ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ খুবই কম কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে বাংলাদেশের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

❑ LDC থেকে উত্তরণের সুবিধা

LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি কিছু সুবিধাও পাবে—

- ➢ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরুপ, দেশের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক সংকেত পাবে এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পাবে।
- ➢ সুদের হার বাড়লেও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বৈদেশিক ঋণ পাওয়া সহজ হবে এবং ব্যবসায়ীদের LC (Letter of Credit) নিশ্চিতকরণের খরচ বিদেশি ব্যাংকগুলি কমিয়ে দেবে।
- ➢ বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সরকারের ভ্যাট, ট্যাক্স এবং রাজস্ব আদায়ও বাড়বে।

বিগত বছরের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘ট্রুমান মতবাদ (১৯৪৭)’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা দিন। [৪৬তম বিসিএস]
- বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]
- কূটনীতির বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। [৪৩তম বিসিএস]
- টিকা কূটনীতি বলতে কী বোঝেন? [৪১তম বিসিএস]
- পররাষ্ট্রনীতিতে জনকূটনীতির গুরুত্ব কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। [৪০তম বিসিএস]
- সিডো (CEDAW)-এর গুরুত্ব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস]
- অর্থনৈতিক কূটনীতি কী? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব আলোচনা করুন। অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? [৪০তম বিসিএস]

বিগত বছরের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের বহিঃ উপাদানগুলো কী? [৩৭তম বিসিএস]
- দ্বৈত ট্র্যাক (Dual Track) কূটনীতি কী? [৩৭তম বিসিএস]
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তিগুলো কী? [৩৬তম বিসিএস]
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো কী কী? [৩৫তম বিসিএস]
- জাতিসংঘ সনদ (UN Charter) অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) গঠন ও মূল দায়িত্ব কী? [৩৫তম বিসিএস]
- সামসময়িক বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তির ভারসাম্যের প্রতিফলনে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারসমূহের দাবি আলোচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy